দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

নিম্নবর্গীয় চেতনা—সংজ্ঞা, লক্ষণ—

বাংলা কথাসাহিত্যে এই চেতনার ক্রমবিকাশ ঃ বিশেষ পাঠ— ছোটগল্প

ইতিহাস— ইতিহাসতত্ত্ব ও সাবঅলটার্ন ইতিহাসচর্চার উৎস

'ইতিহাস' শব্দটা শুধুমাত্র রাজরাজড়ার জীবনী বা উত্থানপতনের ধারাবাহিক বিবরণকে বোঝায় না, মানবসমাজ দীর্ঘকাল ধরে যে নিয়মে বিকশিত হয়, তাও ইতিহাস। অতীতকালের মানুষের কর্মকাণ্ড ও তৎসংশ্লিষ্ট বর্তমানকালিক জিজ্ঞাসার তথ্যপ্রমাণ সম্বলিত উত্তর খুঁজে বার করাও ইতিহাসের কাজ। মানুষের এতকালের কর্ম, কীর্তি বা অবদান এবং তার প্রতিক্রিয়ার কথা ইতিহাস যখন আমাদের জানায়, তখন সে ঐ সব ব্যাপারের স্বরূপগুলিও আমাদের সামনে ধরে দেয়— আর সেইজন্যেই মানবচেতনায় 'ইতিহাস' এত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের মন, তার চেতনাজগৎ— নিত্য প্রসারণশীল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে আমরা যত তাল মেলাচ্ছি, ততই খুঁজে ফিরছি অতীত ইতিহাস, স্বপ্নে দেখছি এক আলোকদীপ্ত ভবিষ্যৎ। আমাদের দেহটা সম্পৃক্ত হ'য়ে আছে একটা বিশেষ দেশ ও কালের সঙ্গে, কিন্তু সেই গণ্ডিটা ছাড়িয়ে ইতিহাসের তথা অতীত সময়ের স্রোতের মধ্যে নিজের অবস্থানকে এবং সকলকে বুঝতে চাওয়ার একটা অনুসন্ধিৎসা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি। কাজেই, আমাদের জীবনের সার্বিক প্রশ্নে ও মীমাংসায় ইতিহাসের বিশেষত্ব ও ব্যাপকতা এত জোরালো ও গভীব যা আমাদের ইতিহাসমুখীনতায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। আমরা জানি ইতিহাস মানে যা নদীর মতোই অবিশ্রান্ত ও ধারাবাহী। অগণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে মানুষের মুক্তির প্রচেষ্টাকে যদি ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য বলে ভাবা হয় তাহলে এক অর্থে 'ইতিহাসচেতনা' গণতান্ত্রিকচেতনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বহুকালপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন— 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই'। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না'।[১] কেননা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমাদেব ইতিহাস রচনা 'সাম্রাজ্যবাদই শত্রু' ধারণায় বশবর্তী হয়ে পরিচালিত হয়েছে। 'ইতিহাস'কে

নিয়ে আমরা কোনো প্রশ্নমালা বা বিকল্প প্রস্তাবনার প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারিনি। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় রনজিৎ গুহ ও তৎসহ কিছু লেখকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'সাবঅলটার্ন স্টাডিস' আমাদের সামনে কতগুলো প্রশ্ন ও সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে। তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে নিছক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে ইতিহাস লিখলে সে ইতিহাস উচ্চবর্গের রাষ্ট্রের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। 'সমগ্রজাতির' যে একটি অখণ্ড ইতিহাস আছে তা এলিটিষ্টদেরই ইতিহাস, তাদেরই সংশয়াতীত প্রাধান্য। সেই ইতিহাসে কৃষকের কল্পনা, মজুরের কল্পনা বা সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত মানুষের কল্পনার জগৎকে উচ্চবর্গের তথা রাজনীতির পক্ষে আত্মসাৎ করতে হয়।

ইতিহাস হচ্ছে জীবনের নির্দেশিকা। মানুষের বহুমুখী কর্ম, নানাবিধ চিন্তা ও চেতনায় গড়ে ওঠে যে জীবন, সেই জীবনের সীমাহীন রহস্যের জ্ঞান-সাক্ষী হচ্ছে ইতিহাস-জ্ঞান। ইতিহাস-জ্ঞান সমাজ সংস্কৃতির এক স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত দিক। 'ইতিহাস' শব্দটির শব্দজাত অর্থ নিরুপণ যদিও সহজ ও সরল তবুও ইতিহাসের একটি সংজ্ঞাই হল History is a movement in time[২] সময়সীমার মধ্যে ইতিহাস একটি আন্দোলন। যে আন্দোলনের গতি আছে— যা অতীত থেকে বর্তমানে সময়সীমার ভেতর দিয়ে ভবিষ্যতের পানে যাত্রা করে। কাজেই ইতিহাসের গতিশীলতাকে মেনে নিয়ে আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে ইতিহাসের প্রবহমানতা, পবিবর্তন ও স্থিতিশীলতার গুরুত্ব অনুধাবনে, স্বভাবতই সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতির রূপ ও রূপান্তর লক্ষ করা আমদের আবশ্যিক কর্তব্য। ইতিহাস হচ্ছে মানব সভ্যতার বিকাশের এমন এক জটিল ও বহুগাঠনিক প্রক্রিয়া, যা কালের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে ইতিহাসসত্তার সংস্পর্শে, প্রভাবে কালের রূপান্তর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে ইতিহাসগত বিকাশপ্রক্রিয়ায় ও পবিক্রমায়।

'ইতিহাস' চর্চার সূত্রপাত সভ্যতার প্রায় শুরুর সময় থেকে। 'ইতিহাস' হল দেশ, কাল, মানুষের কাহিনী। ঐতিহাসিক মার্ক ব্লখের (Marc Bloch) মতে,

'Science of men in time.' ইতিহাস রচনার ঐতিহ্য প্রায় আড়াই হাজার বছরের হলেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিজ্ঞান হিসেবে ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা বেশি দিনের নয়। জ্ঞান জগতের যে কোন শাখা তখনই বিজ্ঞানের স্বীকৃতি দাবি করতে পারে, যখন তার আহৃত জ্ঞান বাস্তব সত্যের প্রতিফলন ঘটায় এবং সমাজ চেতনা বিকাশে ভূমিকা নিতে পারে। ইতিহাসেরও কাজ হচ্ছে মানুষের গড়া সমাজ ও সভ্যতার উৎপত্তি, গঠন, প্রক্রিয়া, বিকাশ, নিয়ম-ধারা, স্বরূপ, বিস্তৃতি, জটিলতা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে উন্মোচিত করা। সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত-আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবন-ব্যাখ্যাই ইতিহাস। ইতিহাস সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন বিশ্লেষণ করে, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ মানুষকে ছুঁতে পারে না। ইতিহাস যতটুকু সম্ভব কঠিন সত্যকে আবিষ্কার করে, সেই সত্যের ওপর দাঁড়ায়। তাহলে এই সত্য কোন সত্য? রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বসাহিত্য'-এ যে কথা শুনিয়েছিলেন সেকথাই কি ইতিহাসের সত্যের পক্ষ্যে অনিবার্য হয়ে পড়ে না— ''আমাদের অন্তঃকরণে যত কিছু বৃত্তি আছে সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই। নহিলে আমি আছি বা কিছু আছে ইহার অর্থই থাকে না।''[৩] কিন্তু ইতিহাসে এই 'যোগস্থাপন' বা মানুষে-মানুষে মৈত্রী বিশেষত ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতটা প্রতিফলিত? এই প্রশ্নও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাই— 'ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস'[৪], তাঁর উত্তরও ছিল জানা— 'আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি'।[৫] আর বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখতেন— ''নতুন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝাড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে— তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে— তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি, এরা একমুঠো ছাতুতে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারে।''[৬] এহেন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে

জানতে হলে ইতিহাসদর্শনের গভীরে আমাদের প্রবেশ করতে হয়, কিন্তু এখানেও প্রশ্ন ইতিহাস বুঝতে গিয়েও কি তত্ত্বের প্রয়োজন? তত্ত্ব কি ইতিহাস রচনার উৎস হতে পারে কিম্বা ইতিহাস রচনার দ্বারা কি তত্ত্ব সৃজিত হতে পারে? আগে এই কূটাভাসেরই সমাধান সংক্ষেপে করে নেওয়া যাক। সংস্কৃত ভাষায় 'ইতি হ আস' অর্থাৎ ইতিহাস কথাটির অর্থ 'যা ছিল'। হেরোডোটাসের মতে, 'হিস্ট্রি' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল অনুসন্ধান।

প্রথম সংজ্ঞা অনুযায়ী অতীতের মানুষ ও মানব সমাজ কী ছিল তার বিবরণই ইতিহাস। দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করে বলতে হয় বহমান কালে মানুষ তথা মানবসভ্যতার রূপ ও প্রকৃতি এবং বিবর্তনের ধারার অনুসন্ধানই 'হিস্ট্রি' বা ইতিহাস। ব্যাপকঅর্থে তাহলে আমরা বলতে পারি, মানব সভ্যতার অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রবহমান ধারার কাহিনীই ইতিহাস। ইতিহাস কী এই প্রশ্ন আদতে এক দার্শনিক প্রশ্ন। হেগেলের 'Philosophy of History' প্রকাশিত হওয়ার পর বহু দার্শনিক এই বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রত্যেকেই ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি বোঝার জন্য গভীর চিন্তাশীলতার ওপর জোর দিয়েছেন। এইসব চিন্তা সার্বিকভাবে ধরা পড়েছে E.H. Carr-এর 'What is History ?' (1961) গ্রন্থে। আবার ঐতিহাসিক বিউরি জানাচ্ছেন 'History is a science nothing more and nothing less'[৭], তাহলে ইতিহাসকে বিজ্ঞান হিসেবেই মেনে নিতে হয়। ইতিহাস যে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার ফসল তা আধুনিককালের আর. জি. কলিংউড এর কথাতেও স্পষ্ট—'Science is finding things out, and in that sense history is a science'[৮] বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধিৎসায় ইতিহাসতাত্ত্বিকেরা ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসচর্চার তাৎপর্যের কথা বলছেন।

'আধুনিক ইতিহাসচিন্তায় ইতিহাসের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের সম্বন্ধে অবহিত করে তোলা। সে কারণে মানুষ নিজস্ব অতীতকে বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে আধুনিক যুগে ইতিহাসচর্চা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের হাতধরেই। পরবর্তী পর্যায়ে সমাজবিবর্তনের মধ্যে মানব সভ্যতার যে ধারা প্রবহমান তাতেই ইতিহাসচর্চার ধারাও বিভিন্নখাতে বয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, ভারতীয় ইতিহাসচর্চার প্রথমধারা হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকগোষ্ঠীর কথা মনে রেখে ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ধারাগুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে দিচ্ছি ঃ

১ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকগোষ্ঠী ঃ জেমস্ মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল, ভিনসেন্ট স্মিথ প্রমুখ।

২. জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগোষ্ঠী ঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার প্রমুখ।

৩. মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকগোষ্ঠী ঃ রজনীপাম দত্ত, সুশোভন সরকার, ডি.ডি. কোশাম্বী, রোমিলা থাপার, রামাশরণ শর্মা, ইরফান হাবিব, অমলেন্দু দে, বরুণ দে, বিনয় ঘোষ, সুমিত সরকার।

৪. সাবঅলটার্ন ঐতিহাসিকগোষ্ঠী ঃ রণজিৎ গুহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী চক্রবর্তী, স্পিভাক, গৌতম ভদ্র, জ্ঞান পাণ্ডে, শাহিদ আমিন প্রমুখ।

'সাবঅলটার্ন স্টাডিস' শুধু যে ভারতীয় ইতিহাস চর্চাকেই প্রভাবিত করেছে তা নয়, ভাষাসাহিত্য, চলচ্চিত্র, শিল্পকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও একটা আলোড়ন তুলেছে। আর এই সাবঅলটার্ন ইতিহাস চর্চার ধারা পথেই হালআমলে জন্ম নিয়েছে পোষ্টমডার্ন ইতিহাসচর্চা। মিশেল ফুকো, জাক দেরিদা, লিওনার্ড, লাকাঁ, রঁলা বার্ত, হাবেরমাস, রায়ান, ফ্রেডরিক জেমসন, ক্রিষ্টেফার নরিস প্রমুখের হাত ধরে। ভারতবর্ষেও অতি সম্প্রতি পোষ্টমডার্ন ইতিহাসচর্চা দেখা যাচ্ছে। গায়ত্রী

চক্রবর্তী স্পিভাক, দীপেশ চক্রবর্তী, জ্ঞান প্রকাশ, জ্ঞান পাণ্ডে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র এবং আরও অনেক নতুন নতুন গবেষক এ ধারায় গবেষণার জন্য এগিয়ে আসছেন। বাংলা ভাষাতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সুধীর চক্রবর্তী, তপোধীর ভট্টাচার্য, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাল দাশগুপ্ত, প্রদীপ বসু, জয়া মিত্র, শেফালী মৈত্র, সুকান্ত চৌধুরী, অভিজিৎ চক্রবর্ত্তী, অঞ্জন গোস্বামী, অজিত চৌধুরী, বৈরাগ্য বসু, বাসব সরকার, দিব্যেন্দু হোতা, সৌরীন ভট্টাচার্য, শোভনলাল দত্তগুপ্ত, অজিত রায, আনন্দ ঘোষহাজরা, প্রমুখ ব্যক্তি এই ধারাকে পুষ্ট করে চলেছেন। এক্ষেত্রে বাংলা লিটল ম্যাগাজিনগুলোর ভূমিকাও মনে রাখার মতো, বিশেষ করে 'প্রতিক্ষণ', 'হাওয়া-৪৯', 'অনুষ্টুপ', 'চতুরঙ্গ', 'যোগসূত্র', 'আলোচনা চক্র', 'তৃতীয় ভুবন', 'অমৃতলোক', 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য।

আমরা আলোচনার শুরুতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলাম যে ইতিহাস রচনায় কতটা তত্ত্বের প্রয়োজন? এই প্রসঙ্গে বলতে হয় ইতিহাসের তত্ত্ব ও পদ্ধতি নিয়ে গত দুই-তিন শতক জুড়ে নানা বিতর্ক ও আলোড়ন শুরু হয়েছে। সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি জ্ঞান জগতের নানা শাখা-প্রশাখার কাছ থেকে নানা উপাদান ও উপকরণ ইতিহাস নিয়েছে এবং ইতিহাস নিজেকে সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে মেলে ধরতে পেরেছে। কাজেই ইতিহাসের তত্ত্ব ইতিহাসের রচনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। ইতিহাসের বেশকিছু তত্ত্ব সমাজ পরিবর্তনের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করে, জোর দেয় সমাজের বৃদ্ধি, বিবর্তন ও ভাঙনের বর্ণনায়। ভারতবর্ষে M.N. Srinivas সমাজে সাংস্কৃতিক বিভাজনের ধারনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন যা 'সংস্কৃতায়ণ' (Sanskritization) নামে খ্যাত। ইতিহাসের তত্ত্ব সমাজ পরিবর্তন ও পরিমার্জনে প্রধানত দুটি ধারায় পরিচালিত হয়েছে হারবার্ট স্পেনসার-এর (Herbert Spencer) 'বিবর্তন ধারা' ও কার্ল মার্কস-এর (Karl Marx) 'দ্বন্দ্বমূলক মতবাদ'। স্পেনসার তত্ত্বগত ধারণাকে পরবর্তীকালে

ডুর্খাইম (Durkheim) ও ওয়েবার (Weber) পরিমার্জিত করেছিলেন। স্ট্রাকচারালিস্ট, ফাংশনালিষ্ট, সোসাল অ্যানথ্রপলজিষ্টরা যে আলোচনা শুরু করেছিলেন এই শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে, যা ষাটের দশক পর্যন্ত চলেছিল, সেখানেই সমাজ পরিবর্তনের চেয়ে কাঠামো পরিবর্তনের চিন্তা বেশি হয়েছিল। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের সবচেয়ে জনপ্রিয় তত্ত্বাদর্শ হল মার্কসবাদীতত্ত্ব। এই তত্ত্বকে পরিপুষ্ট করেছেন বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আদলে লেনিন, স্টালিন, গ্রামশি, লুকাচ, পল সুইজি, হবসবম, ই.পি. থমসন, পেরি অ্যাণ্ডারসন প্রমুখ নামজাদা তাত্ত্বিকেরা। ইতিহাসচর্চায় তত্ত্বের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে নতুন তাত্ত্বিক কাঠামোর সন্ধানে ব্রতী আছেন সমাজতাত্ত্বিক নববার্ট ইলিয়াস (Norbert Elias) ও দার্শনিক মিশেল ফুকো (Michel Foucault)। মিশেল ফুকো তাঁর 'ডিসিপ্লিন অ্যাণ্ড পানিশ'-এ (1975) ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে দেখার চেষ্টা করেন। তিনি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের উপাদানের সাহায্যে, বিশেষ করে শিল্প ও সাহিত্যের ব্যবহারের দ্বারা ইতিহাসকে বোঝার চেষ্টা করেছেন।

পোষ্টমডার্ন ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের প্রগতির তত্ত্বকেই প্রত্যাহ্বান জানিয়েছেন। মার্কসবাদ ও উদারনৈতিক মানবতাবাদের পরিবর্তে তাঁরা উদারনীতিকেই গ্রহণ করেছেন। মিশেল ফুকো, জাক দেরিদা (Jacques Derrida) নীৎসে (Nietzsche) হাইডেগারের (Heidegger) দর্শনের সাহায্য নিয়ে তাঁদের নতুন তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তুলেছেন। তাঁরা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের উপর গড়ে ওঠা সমাজ বিজ্ঞানকেই প্রত্যাহ্বান জানিয়ে নতুন 'ডিকনষ্ট্রাকশন' তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। দেরিদা প্লেটো থেকে ফুকো পর্যন্ত জ্ঞানতত্ত্বকে প্রশ্ন করে সোস্যুর, নোয়াম চমস্কির ভাষা-বিজ্ঞানের সূত্রের ন্যায় ইতিহাস তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে নতুনরূপে দেখেছেন, যে অনুসন্ধান এখনও বহমান। পোষ্টমডার্ন ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের এমন সব গলি-ঘুঁজিতে উঁকি মেরেছেন, যে পথ এর আগে ঐতিহাসিকেরা মাড়াননি— যেমন-নারী-ইতিহাস, দলিত নিম্নবর্গ, অভিবাসী, দাসসমাজ, সমকামী

ও পতিতা প্রভৃতি। এডওয়ার্ড সাঈদ (Edward Said) পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক ইতিহাসতত্ত্বের বিরোধিতা করে এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার উন্নয়ণকামী দেশগুলির নিজস্ব তত্ত্বের অনুসন্ধানের কথা বলেছেন। সত্তর ও আশির দশকে সামাজিক ইতিহাস থেকে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে বেশি জোর পড়ে। ক্লিফোর্ড গির্য়াৎজ্ (Clifford Geertz) ও পিয়ের বোরডিও (Pierre Bourdieu) এর নতুন তত্ত্বসূত্রও এক্ষেত্রে সহায়ক হয়। টেক্সটের নতুন পাঠ, ম্যাক্রোর জায়গায় মাইক্রোহিস্ট্রির আধিপত্য শুরু হল।

'ইতিহাস চর্চা 'from the top down' দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে 'history from below' এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শুরু করে সাবঅলটার্ন স্টাডি -র মাধ্যমে। যদিও এর আগে ফ্রানজ্ ফেননের 'Wretched of the Earth', এ.এল মটর্নের 'People', রডনে হিলটনের 'Bondsmen', জর্জ রুডের 'Crowd', ই.পি. থমপসনের 'Working Class', এরিক হবসবমের 'Primitive Rebels', অ্যালবার্ট সোবাউলের 'Sansculottes' এবং হোমি ভাবার 'In the Location of Culture' সাবঅলটার্ন চর্চার প্রেক্ষিতকে বুঝতে সাহায্য করে।

'তথ্যপ্রমাণ অপেক্ষা তত্ত্বমূলক ভাবনা যে ইতিহাস আলোচনায় জরুরি, একথা রবীন্দ্রনাথও আমাদের জানিয়েছেন। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস যে সামাজিক ইতিহাস— রবীন্দ্রনাথ এ শতকের সূচনাতেই সে কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ প্রবহমান সমাজজীবনেই ভারতের ইতিহাসকে পাওয়া যায়, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে নয়। আজকের হালফিল দুনিয়ায় 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' (Subaltern Studies) রচনার দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব স্বীকৃত হচ্ছে। এই ইতিহাসচর্চায় আলোচিত হচ্ছে যে শুধু রাজা বাদশাহের কীর্তিকলাপই নয়, সাধারণ মানুষের কাহিনীও ইতিহাসের উপজীব্য বিষয়। ১৯০২ সালে রচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। প্রবন্ধটির একটি অংশ এই মন্তব্যের সমর্থনে রাখা হল—

"দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ... তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে, যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। ....সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মসজিদের ফেনবুদ্‌বুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোজাপ্রহরিরক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন-এ সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী? তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে— সেই পুঁথিখানি কেহ খোলে না, সেই আরব্য উপন্যাসেরই প্রত্যেক ছত্র ছেলেরা মুখস্থ করিয়া লয়। তাহার পরে প্রলয়রাত্রে এই মোগলসাম্রাজ্য যখন মুমূর্ষু, তখন শ্মশানস্থলে দূরাগত গৃধ্রগণের পরস্পরের মধ্যে যে সকল চাতুরী প্রবঞ্চনা হানাহানি পড়িয়া গেল, তাহাও কি ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত? এবং তাহার পর হইতে পাঁচ পাঁচ বৎসর বিভক্ত ছক-কাটা শতরঞ্চের মতো ইংরেজ শাসন, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ আরো ক্ষুদ্র; বস্তুত শতরঞ্চের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার ঘরগুলি কালোয় সাদায় সমান বিভক্ত নহে, ইহার পনেরো-আনাই সাদা।"[৯] এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতের মধ্যযুগ থেকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মধ্যে ভারতের মূল ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে প্রশ্ন, ভারতবর্ষের সেই ইতিহাস কোথায়? এরও উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন— "কিন্তু বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনো ছিল, নহিলে এই-সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লী এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।"[১০] এই না পাওয়া বিবরণের ইতিহাস অনুসন্ধানে সাবঅলটার্ন ঐতিহাসিক-গোষ্ঠী

রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে বাইরে রেখে ভারতীয় সমাজজীবনের অন্দরমহলে ঢুকে পড়তে চাইছেন। আর এ থেকেই ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিস'-এর আবির্ভাব ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিস'-এর আগমন মার্ক্সীয় ইতিহাসচর্চাকে খণ্ডন করলেও সে অর্থে তাঁরা মার্ক্সবাদ বিরোধী নন। বহুকাল আগে ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ আমাদের শুনিয়েছিলেন—''প্রত্যেক জাতির সমস্যা সেখানেই, যেখানে তাহার অসামঞ্জস্য।''[১১] এই অসামঞ্জস্যকে দূর করে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টার মধ্য দিয়েই ঘটে ইতিহাসের অগ্রগতি। ১৯৮২ সালে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিস'-এর প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩ সালে সাবঅলটার্ন স্টাডিস সম্মেলন ও ১৯৯৮-এর জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সম্মেলন, ২০০২-এ হুগলী মহসিন কলেজে অন্তেবাসী ও প্রান্তিকবর্গ নিয়ে ঋদ্ধ আলোচনাচক্র ও গত সতেরো বছরে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে একাদশখণ্ডে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিস সংকলন' প্রকাশিত হওয়ার ঘটনা ইতিহাসের অগ্রগতির পক্ষেই কথা বলে। গত ষোল-সতের বছরে এই 'সাবঅলটার্ন স্টাডিস'-এর লেখাপত্রকে কেন্দ্র করে কেবলমাত্র ইতিহাসচর্চার মহলেই নয়, ভাষাসাহিত্য শিল্পচর্চার এলাকাতেও এই ইতিহাসচর্চা ও ইতিহাসতত্ত্বের প্রতিফলন বিশ্লেষিত হচ্ছে।

১৯৮২-১৯৯৯ পর্যন্ত মোট দশটি খণ্ডে ৭৪টি প্রবন্ধমাল' সংকলিত হয়েছে। ইতস্তত সাবঅলটার্ন স্টাডিস-এর বিভিন্ন দিক ও বিষয় নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন ও করছেন। বাংলা ভাষাতে গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' নামক একটি সংকলন গ্রন্থ ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় বিশেষত 'এক্ষণ', 'অনুষ্টুপ', 'যোগসূত্র', ইত্যাদি লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার তত্ত্ব ও দর্শনসংক্রান্ত কিছু প্রবন্ধ বঙ্গীয় বৌদ্ধিক মহলে আলোড়ন তোলে। ১৯৯৯ সালের ৩০শে জুলাই সাবঅলটার্ন স্টাডিস-এর অন্যতম তাত্ত্বিক প্রবক্তা গায়ত্রী চক্রবর্ত্তী স্পিভাক-

এর 'আ ক্রিটিক অব পোষ্টকলোনিয়াল রিজন ঃ টুওয়ার্ড আ হিস্ট্রি অব দ্য ভ্যানিশিং প্রেজেণ্ট' (হাভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, সিগাল; পৃঃ ৪৫০, মূল্য ৬৫০ টাকা) বইটি যথেষ্ট আলোড়ন তোলে। রণজিৎ গুহ ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে— 'এলিমেণ্টারি আসপেক্টস অব পেজেণ্টস ইনসারজেন্সি ইন কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া', সাবঅলটার্ন স্টাডিস-এর তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তি রচনা করে দেন, যার বিস্তার ঘটে পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন রচনায় ও 'সাবঅলটার্ন স্টাডিস'-এর বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রচনায়। তাছাড়া, সাবঅলটার্ন (Subaltern) কথাটি যেহেতু গ্রামশির 'জেলখানার নোটবই' থেকে নেওয়া এবং নিম্নবর্গের ইতিহাসদর্শনে গ্রামশির 'ক্ষমতা (Power) ও আধিপত্য (Hegemony) -এর ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেহেতু বাংলা ভাষায় শোভনলাল দত্তগুপ্ত সম্পাদিত দুইখণ্ডে 'আনতোনিও গ্রামশি-বিচার-বিশ্লেষণ', সৌরীন ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গ্রামশি পরিচয়' (১৯৯৩), নরহরি কবিরাজ, অজিত রায় প্রমুখের গ্রামশি সংক্রান্ত আলোচনা আমাদের বাংলাসাহিত্য বিশেষতঃ কথাসাহিত্যের জগৎকে একটু অন্য দৃষ্টিকোণ ও অন্যমাত্রায় দেখতে সাহায্য করে।

'রণজিৎ গুহ যেখানে শুরু করেছিলেন Negation বা অস্বীকৃতি দিয়ে, গায়ত্রী চক্রবর্ত্তী স্পিভাক সেখানে আনেন Deconstruction বা বিনির্মাণের ধারণা। আর সাবঅলটার্ন চর্চার বিস্তার তৃতীয় পর্বে শুরু হয়েছে হোমি ভাবার Hybridity (বর্ণসংস্কার) দিয়ে। হোমি ভাবা 'সাবঅলটার্ন স্টাডিস'-এর কোনোখণ্ডে না লিখলেও তাঁর Hybridity তত্ত্ব দশম খণ্ডের রচনাগুলিতে যথেষ্ট ছাপ ফেলেছে। এই সমস্ত তত্ত্বের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দুই সমাজভাবুক আনতোনিও গ্রামশি ও মিশেল ফুকোর ক্ষমতা ও আধিপত্যের ধারনাগুলোকে একত্রিত করে নিম্নবর্গীয় চেতনার স্বরূপ ও প্রেক্ষাকে আমাদের অভিসন্দর্ভে বোঝার চেষ্টা করেছি। এখানেও প্রশ্ন, 'ইতিহাস' নামক বিদ্যাশৃংখলার সঙ্গে 'সাহিত্য' শাখার সম্পর্ক কতখানি?

ইতিহাসতত্ত্ব কি চর্চিত হতে পারে সাহিত্যসৃজনে—এসবেরই সমাধান এবারে একটু সংক্ষেপে করতে পারি— প্রথমে দ্বিতীয়টির উত্তর দেওয়া যেতে পারে। যে কোনো 'তত্ত্ব' মানেই দেখার পাঠ। অর্থাৎ নতুন জীবন দৃষ্টি। 'তত্ত্ব' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ এরকম- তৎ = তাহা (Is, That) + উয়া (Thia, গ্রিকশব্দ) = দৃষ্টি, অর্থাৎ তাহা সম্বন্ধীয় = জ্ঞাতব্য। Theatre > Theorum (জ্যামিতিক) > Theory = দেখা। 'তত্ত্ব' থাকে জীবনের বয়ানে। আর সাহিত্য তো জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। 'জলের থেকে ছিঁড়ে গিয়েও যে জল' তার-ই তো অনুসন্ধান করে তত্ত্ব। জীবনের মধ্যে আর এক জীবনদর্শনই তত্ত্বের অভিপ্রেত। তাছাড়া, 'Text is a differential Network' একথা আমরা জানি এবং মানি। সুতরাং ইতিহাসদর্শন ও ইতিহাসতত্ত্ব একধরনের জীবনদর্শন। সেহেতু এই ইতিহাসগত দর্শন সাহিত্যের টেকস্টের জীবনদর্শনে কতখানি প্রতিফলিত সেই আন্বিক্ষীকি প্রয়াসে এই গবেষণা-সন্দর্ভের ঔৎসুক্য। সেই সূত্রে ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কটাকে একটু জরিপ করে নিচ্ছি।

ইতিহাস ও সাহিত্য

সাহিত্য ও ইতিহাস কিম্বা ইতিহাস ও সাহিত্য— এই দু'য়েরই পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের সকলেরই অবগত। ইতিহাসে যেখানে প্রাধান্য পায়— ঘটনার ধারা ও ধরণের ধারাভাষ্য, দৃশ্যত ও প্রত্যক্ষত ঘটনার বিবরণ সেখানে সাহিত্যসৃজকের সুবিধে হলো, তিনি ঘটনার ফলিতরূপের ঊর্দ্ধে উঠতে পারেন। বিশ্বজনীন তত্ত্ব নির্মাণের ব্যাপারে তিনি প্রায় বিশ্বকর্মার সমান। ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দেন, ঘটনাটিকে বোঝেন, বোঝার চেষ্টা করেন। সেখানে গল্পকার 'বোঝা'-র জরুরি কাজটিকে আগে সারেন। তাঁর দৃষ্টিপথে, তাঁর চৈতন্যে আপতিক সত্যকে বাস্তবিক বা কাল্পনিক চরিত্রের আশ্রয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চান। 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক' গ্রন্থের 'মুখবন্ধ' -এ অমলেশ ত্রিপাঠী যথার্থই বলেছেন—

ঐতিহাসিকের নেই কবির মতো কল্পনার স্বাধীনতা, দার্শনিকের মতো বিশ্বজনীন তত্ত্ব নির্মাণের অধিকার, শিল্পীর মতো অরূপকে মূর্ত বা বিমূর্ত রূপ দেবার আকুতি।"[১২] তবু ইতিহাসতো শুধু অতীতের ইতিবৃত্ত নয়, সালতামামি বা নামাবলী কীর্তনও 'ইতিহাসচেতনা' নয়। যা ঘটে, যা ঘটেছে তার কার্যকারণসূত্র আবিষ্কার সহজ নয়। সাহিত্যকে ইতিহাসের দ্বন্দ্ব মুখর গতিপ্রবাহের স্বরূপটিকে আবিষ্কার করতে হয়। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিরোধ-তারও ইতিহাস আছে। সাহিত্যিক সেই ইতিহাসকে নিজের মতো করে দেখান।

ইতিহাসের কাছে আমাদের প্রার্থনা সত্যের । কথাসাহিত্যের কাছে আমাদের বাসনা আনন্দের। রবীন্দ্রনাথের নায়িকা বাঁশরী বলেছিল, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য। বাঁশরীর ভাবনার সেরা দৃষ্টান্ত আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভে উপস্থাপিত বিস্মৃতপ্রায় চারজন গল্পকারের কথাজগৎ।

এখন প্রশ্ন, একজন ঐতিহাসিক কি পারেন একজন ব্যক্তির মানসপ্রতিমা নির্মাণ করতে? তার মধ্য দিয়ে অতীতকে অতিক্রম করে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের সঙ্গে সেতুবন্ধন রচনা করতে? ঐতিহাসিকের পক্ষে এই না-পাবাটা অক্ষমতা বা অন্যায় নয়। আসলে এ কাজই তাঁর নয়। এ কাজ একজন সাহিত্যসৃজকের। এ প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্ত্তী স্পিভাকের ভাষ্য মনে পড়ে—"History deals with real events and literature with imagined ones may now be seen as a differences in degree rather than in kind." (1997 : 77)

মানুষ ও তাঁর বাস্তব জীবন নিয়েই সাহিত্যের কারবার. একমাত্র তার সঙ্গেই সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের প্রাণ' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন—'সাহিত্যের জগৎ মানেই হচ্ছে মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশ্রিত জগৎ'[১৩] প্রবন্ধটির নামকরণ ও ঐ মন্তব্য দুই-ই আমাদের ভাবরাজ্যে চিন্তা উদ্রেক করে। সাহিত্যের প্রাণই মানুষেব সঙ্গে মিশ্রিত জগৎ। মানুষ আর জগৎ, ফলকথা মানব সমাজ। কিন্তু সাহিত্যে স্থান পাবার অধিকার মুখ্যত সমাজের কোনো এক অংশের নয়,

তা যদি হয় তবে সে দর্পণে সমাজের আংশিক চিত্র প্রতিবিম্বিত, সমগ্র সমাজ তাতে প্রতিফলিত নয়। সমাজের ছোট-বড়, উচ্চ-নিচ সবারই সমান অধিকার আছে সাহিত্যে স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্যে প্রতিভাসিত হবার, —যেহেতু সমাজ বহু মানুষের, নানা শ্রেণীতে বিভক্ত মানুষের সমষ্টিরূপ।

সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত-আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবন ব্যাখ্যাই ইতিহাস। ইতিহাস সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন বিশ্লেষণ করলেও নিঃসঙ্গ-একলা মানুষকে ছুঁতে পারে না। রিচার্ড কোব (Richard Cobb) বলেছেন 'ইতিহাস বিশেষ মানুষকে নিয়ে।' আবার নেমিয়ার শোনান, 'ইতিহাসের মধ্যে কোনো অর্থ খুঁজতে যাওয়াই মূর্খতা।' তাঁর ভাষায়— "Historians imagine the Past and remerber the future."[১৪] অন্যদিকে ব্যারাক্লো জানাচ্ছেন— ''আপন নাভির ধ্যান না করে ঐতিহাসিককে ইতিহাসের মূল্য খুঁজতে হবে বাইরের কোন মহত্তর লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে''[১৫] কেননা, জীবনের দাবি— 'চরৈবেতি', সুতরাং নেমিয়ারের ভাষ্য যাই বলুক না কেন, ঐতিহাসিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসকে সেই পরিবর্তনের সাক্ষী অবশ্যই থাকতে হবে। ইতিহাসের চরিত্রগুলি সাধারণ পরিবর্তনের স্রোতে কেমন করে পাল্টায়, তাকে লক্ষ্য করাই ঐতিহাসিকের কাজ। বাইরে থেকে ঘটনার বর্ণনা করাই ঐতিহাসিকের প্রধানতম দায়িত্ব। ঘটনার ভেতরে ঢোকার ছাড়পত্র পায় সাহিত্যিক, জীবনের অভ্যন্তরীণ বক্তব্যকে উন্মোচন করার দায়িত্ব তাঁর। জীবনের অভ্যন্তরীণ সত্য প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে।

বর্তমান ইতিহাসচর্চায় মানসিকতা (mentality) ও মেজাজের বিশ্লেষণ একটি প্রধান চেষ্টা। ইতিহাস যে বিজ্ঞান এবং ইতিহাস যে সাহিত্য— এই দুই উপলব্ধিই 'নতুন' ইতিহাসচর্চার লক্ষ্য। মানুষ একই সঙ্গে মুক্ত ও বন্দী, সামাজিক ও একলা। মানুষ বাদ দিয়ে ইতিহাস নেই, আবার একক মানুষের বা নিঃসঙ্গ মানুষেরও ইতিহাস নেই। যা আছে সাহিত্যে। উদাহরণ হিসেবে 'ঢোঁড়াই চরিতমানস', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' কিংবা টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এর

নাম করতে পারি। টি.এস. এলিয়ট 'Tradition and the Individual Talent' প্রবন্ধে কিংবা জীবনানন্দ দাশ 'কবিতার কথা'-য় কবির পক্ষে ইতিহাসচেতনার কথা বলেন। ইতিহাসচেতনা না থাকলে দান্তে কি লিখতে পারতেন 'ডিভিনা কমেডিয়া' বা শেকস্‌পীয়র থেকে ব্রেখট্‌ তাঁদের ঐতিহাসিক নাট্যাবলী, বাংলাভাষাতেও বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তারাশঙ্কর, বর্তমানকালে মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায় বা অতিসম্প্রতি ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন, অনিল ঘড়াই, অমর মিত্রেরা তাঁদের উপন্যাস?

এতকিছু বলার পরও ভাবনা হয়, ইতিহাস তাহলে কী? শুধু অতীত? রাজন্যদের কাহিনী? অতীত না হয়ে বর্তমান? নাকি ভবিষ্যৎ? অনেকবছর আগে গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এবং থুকিডিডিস যখন পৃথিবীতে প্রথম মানুষের সামাজিক দলিল রচনা করলেন, তারপর থেকেই ইতিহাস পর্ব-পর্বান্তরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে। রুশো, কাণ্ট থেকে শুরু করে হেগেল, মার্কস হয়ে সার্ত্র, ব্লখ, গ্রামশি, আলথুজার, ইগলটন্‌, ফুকো, দেরিদা পর্যন্ত অনেকেই ইতিহাসকে তাঁদের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। হেরোডোটাস যদি সার্বিক ইতিহাসের জন্মদাতা হন, থুকিডিডিস তাহলে অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম প্রবক্তা। রুশো ও কান্ট যথাক্রমে সামাজিক চুক্তির ও জ্ঞানদীপ্তির ওপর জোর দিলেন। হেগেল মানব ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা অন্বেষণ করলেন, মার্কস গুরুত্ব দিলেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ওপর। গ্রামশি গুরুত্ব দিলেন সংস্কৃতিতে। সার্ত্র অস্তিবাদী চিন্তার এক নতুন বোধের উন্মোচন করলেন। ব্লখ অনন্ত সময়ের মধ্যে ইতিহাস অন্বেষণে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ফুকো এসে প্রথাবদ্ধ ইতিহাসকে খোলনলচে বদলে দিতে তৎপর হয়ে উঠলেন। আঠারো শতকের জ্ঞানদীপ্তির নামে বুর্জোয়া শ্রেণীচৈতন্যে তখন এক বড়ো ধাক্কা লাগল। সাম্রাজ্যবাদের পুরনো কলাকৌশলকে এভাবেই আক্রমণ করতে শেখালেন গ্রামশি, ফুকোরা। দেরিদা প্রগতির ছদ্মবেশে আসা নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদকে আক্রমণ করলেন। ইতিহাস আর উত্তর-

আধুনিকতাবাদ বা আধুনিকোওরবাদ এভাবেই হাত ধরাধরি করে চলতে লাগল। ফলে সময় যত এগিয়েছে ইতিহাসচর্চা রাজন্যদের বা উচ্চবর্গীয় কাহিনীর পরিমণ্ডল ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের ও নিম্নবর্গের (Subaltern) আখ্যান গড়তে শুরু করেছে। *রবীন্দ্রনাথ এই ইতিহাসের আখ্যানকে বুঝতে চেয়েছেন এভাবে,—* "চিরকালেই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই; সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম; সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোষে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে— জীবন যাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে সবকিছু থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিল্‌সুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাঁড়া দাঁড়িয়ে থাকে— উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে ...।"[১৬] এপথেই সমাজে তৈরি হলো দু'টি শ্রেণী। একদিকে সামাজিক-ধর্মীয়-রাষ্ট্রিক-অর্থনৈতিক সুবিধা ও মর্যাদাভোগী অগ্রসর শ্রেণী আর অন্যদিকে গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ সর্বঅর্থে যারা সমাজকে বাঁচিয়ে রাখল, তারাই হ'ল অন্ত্যজ— অনগ্রসর নিম্নবর্গীয় শ্রেণী। এই শ্রেণীবিভাজন ও নিম্নবর্গীয় চেতনা সংকেতিত হ'ল রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' (১৯৪০) কাব্যের 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায়—

"ক্ষুধাতুর আর ভুরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে

ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুঠের ধন
যদি এ ভুবনে থাকে আজও তেজ
কল্যানশক্তির

ভীষণযজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোক
জাগিবে নূতন দেশে।''

নিম্নবর্গ— ইতিহাস জিজ্ঞাসা ও সমাজব্যাখ্যা

'আমাদের দেশে যে সংস্কৃতি ছিল প্রাক্-ঔপনিবেশিক কাল থেকে বহমান, সেই সংস্কৃতি আজ পাল্টে যাচ্ছে সম্পূর্ণভাবে। চিরাচরিত স্রোতের বিরুদ্ধে বিপ্রতীপ স্রোতের অনুসন্ধান চলেছে প্রতিনিয়ত। এতোদিন ধরে উপনিবেশবাদী এলিটিজ ম এবং জাতীয় ধনী-বণিকবৃত্তি জাত 'এলিটিজম' সংস্কৃতির যে পশরা তৈরি রাখছিল, লক্ষণীয়ভাবে তা গুণগত পরিবর্তন লাভ করছে। স্বাভাবিকভাবে সমাজতাত্ত্বিক ধারণাপুষ্ট শাসিতজনের সংস্কৃতির পুনরুচ্চারণ ও পুর্ননির্মাণ জরুরি বিষয় হয়ে উঠেছে আজ। বৃহত্তর একক (Macro) থেকে আণুবীক্ষণিক (Microscopic) সমীক্ষা ও আলোচনায় চলে যাচ্ছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। জন্ম নিয়েছে, বর্ধিত হচ্ছে ইতিহাসবাদী (historicist) দৃষ্টিভঙ্গি।

আজকাল 'ইতিহাস' নিয়ে যে নানান তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে এবং যে তর্ক-বিতর্কে অংশ গ্রহণ করছেন আধুনিকোত্তরবাদীরা সেই তর্কটা একটু অন্য ধাঁচের। তাঁরা ইতিহাস বিরোধিতার কথা বলছেন। এই বিরোধিতাও আর এক ইতিহাসের জন্ম দিচ্ছে। আধুনিকোত্তর চেতনার পুরোধা বুদ্ধিজীবি জাঁ ফ্রাসোঁয়া লিওতার গ্রাণ্ড-ন্যারেটিভের অনুশাসন অকেজো হওয়ার কথা বলছেন, কেননা ইতিহাসের প্রতিশ্রুতি আজ লুপ্ত। ইতিহাসের ঐতিহাসিক স্বপ্নের মধ্যে আধুনিকোত্তবাদীরা দিবাস্বপ্নের হদিশ খুঁজে পাচ্ছেন। ফলত ইতিহাসের ব্যাখ্যায়, চিন্তার ধরণে আজ আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। জাক দেরিদার 'ডিফারেন্স' সেদিক থেকে একটা বিরাট প্রতীকের মতো। পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীরা আজ ব্যবধান, ভিন্নতা, অপরতা অর্থাৎ

'আদাবনেসেব' অনুসন্ধানে অত্যন্ত আগ্রহী। অভিজ্ঞতার আয়ত ও অনায়াত স্তর তাঁদেব চিন্তা কাঠামোয় এক বিপুল পরিবর্তন আনছে। কাফ্কার এক 'প্যারাবল' এনে ব্যাপারটিকে বোঝানো যেতে পারে, হ্যানা আরেন্ডও তাই কবেছেন। কাফ্কার সেই প্যারাবলে আছে—

> ''তাব শত্রু দু'জন ঃ প্রথম শত্রু তাকে ঠেলছে পেছনের উৎস থেকে সামনের দিকে; আর অপর শত্রু, তার পথ বন্ধ করে বেখেছে সামনে। দু'জনই তার শত্রু, দু'জনের সঙ্গে তার যুদ্ধ। প্রথম শত্রু চায় সে লড়ুক দ্বিতীয়জনের সঙ্গে, দ্বিতীয়জন চায় সে লড়ুক প্রথমজনের সঙ্গে। কিন্তু এই দু'জনই তো তার একমাত্র শত্রু নয়, সে নিজেও নিজের শত্রু, তাছাড়া কে বলবে তার উদ্দেশ্যই- বা কি? দীর্ঘ অমারজনীর কোনো এক মুহূর্তে সে হয়তো স্বপ্ন দেখে শত্রুব মাঝখান থেকে লাফিযে অদৃশ্য হবার, আর লম্ফঝম্পে তাব দক্ষতাও কিছু আছে, তাই ওরকম লাফ, দিতেও পাবে সে, নিবপেক্ষতার ছুতোয, দুই বিবোধিকে পরস্পরের মুখোমুখি কবে।''[১৭]

এই উদ্বৃতিব প্রসঙ্গ টেনে হ্যানা বোঝাতে চেয়েছেন মানুযেব 'চিন্তাব' জন্ম এক যুদ্ধক্ষেত্রে, সেখানে অতীত ও ভবিষ্যতের শক্তি পরস্পবেব প্রতিপক্ষ। এই অতীত ও ভবিষ্যত শক্তির মধ্যবর্তী স্থানে তৈরি হয় চিন্তা এবং চিন্তাব অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা অভ্যেস ও অনুশীলনসাপেক্ষ, তদাবধি এর শেষ নেই সমাধান নেই। এ যে 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে'- এর মতো। স্বাভাবিকভাবেই আধুনিকোত্তববাদীদের যে ইতিহাস বিরোধিতা তা মূলত ইতিহাস চিন্তা প্রসূত। আব এই চিন্তা এমন এক জিনিস, যেখানে শুধু নিরন্তর সংগ্রাম, অনববত লড়াই। যে লড়াই থেকে পালানোর স্বপ্ন দেখা যেতে পারে কিন্তু পালানোর পথ নেই তাই জাক দেবিদাকে মার্কসে চোখ রাখতে হয় এবং মার্কসের সমাজ ইতিহাস পর্যালোচনাব অভিনবত্বে অভিভূত হতে হয়।[১৮] আধুনিকোত্তরবাদীবা শেষাবধি

ইতিহাসবিরোধী তো ননই বরং ইতিহাসের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁরা ব্যথিত। সেই কারণে বর্তমান চিন্তা-চেতনায় আয়ত অভিজ্ঞতার পরিবর্তে অভিজ্ঞতার অনায়াত স্তরের উপলব্ধি, পর্যালোচনা ভীষণভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। এই গুরুত্ব স্বীকরণই তাঁদের ইতিহাসের দিকে আবার ফিরে আসতে উৎসাহিত করছে।

'ইতিহাস' নিয়ে ভাবনা পশ্চিমী ভাবুকদের মতো আমাদের দেশের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলেও যথেষ্ট সংঘটিত হয়েছে। রাজ-রাজড়ার কাহিনীকে যে ইতিহাস বলা যায়না সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গলার ইতিহাস' (বঙ্গদর্শন ঃ মাঘ, ১২৮১), 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (বঙ্গদর্শন ঃ অগ্রহায়ণ- ১২৮৭); 'বাঙ্গালির বাহুবল' (বঙ্গদর্শন ঃ শ্রাবণ ১২৮১); 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' (বঙ্গদর্শন ঃ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯) প্রভৃতি প্রবন্ধে বলেছেন। ঔপনিবেশিক বাংলার উনিশ শতকী ভাবুকেরাও ইতিহাস নিয়ে অনেক কিছু নাড়াচাড়া করেছেন। এঁদের ভাবনায় গুরুত্ব পেয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে, অধুনা চিন্তাবিশ্বে রণজিৎ গুহ'র নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় ভাবুকেরা একনতুন ইতিহাসতত্ত্ব আমাদের সামনে পেশ করেন যা 'সাবঅলটার্ন স্টাডিস' বা 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' নামে খ্যাত। আজ একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে কেবল লিখিত ইতিহাসে জীবনের সকল স্তরের সামগ্রিক বিবরণ বিধৃত হয় না, তার বাইরেও ইতিহাস থেকে যায়। সেজন্য লিখিত বয়ানের আভিজাত্যকে দূরে সরিয়ে রেখে সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে ইতিহাস ধরা পড়ছে এভাবে— (১) যা লেখা হয়েছে, (২) যা প্রবলপক্ষ নির্দেশ করছে বা প্রবলপক্ষের নির্দেশে যার আকল্প বা উপকল্প নির্মিত হয়েছে (৩) যা লেখা হয়নি— অর্থাৎ নিম্নবর্গ, ব্রাত্য, অন্ত্যজ, সাধারণ, সাবঅলটার্ন, জনপদ ও জীবনধারার ইতিহাস। অধ্যাপক রণজিৎ গুহ ও তন্নিষ্ঠ ইতিহাসচিন্তক ও গবেষকেরা আদতে যে সাবঅলটার্ন স্টাডিস প্রস্তাব রাখছেন তন্মধ্যে শেষোক্ত ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের ঔৎসুক্য প্রবল।

'সাবঅলটার্ন স্টাডিস সমাজব্যাখ্যা এবং ইতিহাস রচনার অভিজাত আকল্প (এলিটিষ্ট প্যারাডাইম) ভেঙ্গে দিতে চায়। নিম্নবর্গের বিষয়সমূহে নিমগ্নতা, কার্য এবং চেতনার সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ এবং ক্ষমতা ও ডিসকোর্সের অঙ্গাঙ্গীযোগ বিষয়ে সতর্কতা সাবঅলটার্ন স্টাডিসের লেখকদের বৈশিষ্ট্য। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিস' ইতিহাসকে মনে করে আলাপের একটা পরিসর; ইতিহাস তাদের দৃষ্টিতে ফতোয়া নয়, ডিসকোর্স; ম্যাক্রোলেভেল থেকে মাইক্রো-লেভেল-এ, আয়ত অভিজ্ঞতার বদলে অভিজ্ঞতার অনায়াত ভূগোলের ভাষ্য। সাবঅলটার্ন স্টাডিস 'ডায়ালেকটিক' থেকে 'ডায়লজি'তে সরে আসার বাঙময় ডিসকোর্স রচনা করেছে।

"ইতিহাস'-তো কেবল বড়ো-বড়ো ঘটনার সমারোহ নয়, আর তা যদি হয়ে থাকে তাহলে তাতে ইতিহাসের অভিজাততন্ত্র তৈরি হয়। সাবঅলটার্ন স্টাডিস কিন্তু এই অভিজাততন্ত্রের বিপরীত ভাবনা। এর দৃষ্টিপাত কেন্দ্র— নিম্নবর্গ। 'ইতিহাসে যাদেরকে বিষয়ই মনে করা হয়নি অর্থাৎ কৃষি শ্রমিক, শিল্প শ্রমিক, ক্ষুদ্র হস্তশিল্পী, কারিগর তথা নিচুতলার গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষ, শহুরে শ্রমিক, অপাঙক্তেয় মানুষজন, স্টাডিস তাদেরকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিস'-এর পঞ্চম ভাগে রণজিৎগুহের একটি দীর্ঘ সন্দর্ভ আছে— 'চন্দ্রের মৃত্যু' (Chandra's death), অধ্যাপক গুহ ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র' গ্রন্থের একটি ছোট্টো প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এটি লিখেছেন। ঘটনাটি ১৮৪৯ সালের, ব্যাপারটা এইরকম ঃ—

''চন্দ্র বীরভূমের এক গরীব চাষী পরিবারের মেয়ে। ভগবতী চাষানী তার মা। চন্দ্রের সঙ্গে মগরাম চাষার সমাজ-নিষিদ্ধ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, এর ফলে চন্দ্র হয় গর্ভবতী। ভগবতী, তার ছেলে গয়ারাম, তার মেয়ে বৃন্দ এবং চন্দ্র— সবাই মিলে কালীচরণ বাগদী নামক এক লোকের কাছে সমস্ত কিছু খুলে বলে; গর্ভপাতের ঔষধ দিতে পারলে কালীচরণকে তারা টাকা দেবে জানায়।

টাকার অঙ্গীকারে কালীচরণ ঔষধ দেয়। কালীচরণের ভেষজে চন্দ্রের রক্তাপ্লুত ভ্রূণ বেরিয়ে এলেও, কিছুক্ষণ পরেই চন্দ্র মারা যায়। চন্দ্রের মৃত্যু হলো শেষ রাতে, ভোর হবার তখনো ঘন্টা দেড়েক বাকি; তড়িঘড়ি চন্দ্রের মৃতদেহ নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হয়, নদীতীরে শেষরাত্তিতে চন্দ্রের দাহকার্য সম্পন্ন হয়।''২০

ছোট সংক্ষিপ্ত সাধারণ ঘটনা, এই ঘটনার কতটুকু স্থান থাকতে পারে ইতিহাসে? কিন্তু না, এই ঘটনা ছোট নয়, আবার সাধারণও নয়, কেননা, মানবজীবনের কোনো ঘটনাই তুচ্ছ নয়। বরং আমরা দেখি রণজিৎ গুহের মতো নামী ইতিহাসবেত্তা ও সমাজভাবুক ঊনবিংশ শতাব্দীর বীরভূমের এক গরীব চাষী পরিবারের এই ঘটনাকে অসাধারণভাবে পাঠ করেছেন, জীবনের এক আপাত-তাৎপর্যহীন আখ্যানকে অসামান্য সংকেত ও ব্যঞ্জনায় পুর্নবিচার ও পুর্ননির্মাণ করেছেন।

'সাবঅলটার্ন স্টাডিস' বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যেও আকর্ষণীয়। কেউ কাজ করেছেন কৃষক বিদ্রোহের ওপর, কেউ একেকটা অঞ্চলকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কেউ বিচার করেছেন ধর্ম, কেউ সংস্কৃতি, কেউ আঞ্চলিকতাবাদকে, কেউ মহামারি, মন্বন্তর, দাঙ্গা, কেউ বিচারব্যবস্থা; কেউ সন্ধান করেছেন সাবঅলটার্ন লেলিন; কেউ দেখিয়েছেন কীভাবে জ্ঞানের বিজয় ভারত বিজয়ে পরিণত হলো, কীভাবে ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতের ভাষা শিখে ভারত-শাসনের ভাষা তৈরি করল; কেউ দেখিয়েছেন গান্ধীর প্রভাবমুক্ত মেদিনীপুরের জাতীয়তাবাদী সক্রিয়তা; কেউ ব্যাখ্যা করেছেন জিতু সাঁওতালের বিদ্রোহের স্থানিক শেকড়; কেউ বিশ্লেষণ করেছেন কীভাবে আইনের ডিসকোর্স একটা ঘটনাকে 'কেস' এবং একটা 'মৃত্যু'কে 'ক্রাইম' বলে তার সমস্ত মাত্রা হ্রস্ব করে দেয় ঃ ভারতের মহামারী (১৮৯৬-১৯০০) বিশ্লেষণ করে একজন ডেভিড আর্নল্ড দেখান, কীভাবে নাটকীয় সংঘাতের মুখোমুখি হলো ঔপনিবেশিক ভারতের মানব-শরীর, কীভাবে তা দেশজ রাজনীতি এবং ঔপনিবেশিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরিণত হলো; আরেকটি লেখায় তিনি দেখান

মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে কৃষক-চৈতন্যের কী রকম বদল ঘটল, কীভাবে দুর্ভিক্ষ তাদেরকে অক্রিয়, হতাশ, আশাভরসাহীন করে তুলল; দীপেশ চক্রবর্ত্তী ব্যাখা করেন কলকাতার পাটকল শ্রমিকদের রাজনীতিকে কেন কেবলমাত্র মার্কসীয় শ্রেণী ও শ্রেণীচেতনা দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়; জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে আজমগড়ের একজন মুসলিম জমিদারের উর্দু পাণ্ডলিপির অনুসরণে ভারতের একটা 'কসবা'র অ-সরকারি সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ছবি তুলে আনেন, গায়ত্রী চক্রবর্ত্তী স্পিভাক নিম্নবর্গের সাহিত্যিক শিল্পরূপ হিসেবে মহাশ্বেতা দেবীর 'স্তন্যদায়িনী' গল্পটিকে অন্যভাবে পাঠ করে শোনান।

'নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকগণ যথার্থভাবে দেখাতে পেরেছেন যে ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা আদৌ নির্মোহ ছিল না। প্রথমটির ক্ষেত্রে ভারতের সবকিছুকেই ব্রিটিশ নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যক্ত করেছে। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আদর্শবাদ ও বিরল ব্যক্তিত্বকে ঘিরে স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যাখ্যাত হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই 'জনতা' মূল্যহীন, অপাঙক্তেয় থেকেছে। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকগোষ্ঠী এই অপাঙক্তেয় মূল্যহীন জনতার লৌকিকআচার, কল্প, প্রতীক ও সর্বোপরি কৌমমানস বিশ্লেষণ করে তাদের আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আদতে নিম্নবর্গের ধারণাটি ঔপনিবেশিক ভারতের এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা, গ্রামশির ভাষায়, 'নিম্নবর্গের মানুষের স্বকীয় উদ্যোগের প্রতিটি চিহ্নের তাৎপর্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন।'[২১] নিম্নবর্গ এমন এক ধারণা যা আধিপত্য ও আনুগত্যের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ফলে সৃষ্ট।[২২] সাবঅলটার্ন বীক্ষণদৃষ্টি সম্পর্কে বা এই ইতিহাস তত্ত্বের স্বরূপ বোঝাতে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা লিখেছিল—'fragmentary explorations of popular mentality' এবং 'connected history of the lower classes.'[২৩] সুতরাং প্রথাবদ্ধ ইতিহাসচর্চার সীমানার বাইরে সাবঅলটার্ন স্টাডিস মূল্যায়ণের প্রচেষ্টা সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে দেখাও আজ খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা, ইতালীর সাম্যবাদী

দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি-র দর্শনে যে সাবঅলটার্ন হিষ্ট্রির সূত্রপাত, তারই নানা অব্যাখ্যাত ইঙ্গিত ও সূত্রের সময়োপযোগী পরিমার্জন ও বিশ্লেষণের মধ্যে থেকে উঠে-আসা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার এই ধারাটি অনেকাংশে বিবর্তনশীল সামাজিক বিন্যাস ও সামাজিক সম্পর্কের জটিল ও বহুস্তর বাস্তবতাটিকে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে।

নিম্নবর্গ ঃ সমাজশ্রেণীর বিচারে (সামাজিক পরিচয়)

গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' সংকলন গ্রন্থের (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮) রণজিৎ গুহর 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' প্রবন্ধটি এই ইতিহাস চর্চার ইস্তাহার। এই প্রবন্ধে তিনি জোরালো সওয়াল করেছেন যে নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত সকল শ্রেণী গোষ্ঠী ব্যক্তি ও সমূহকে ঐতিহাসিক গবেষণা ও সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে বক্তব্যের বিষয় বলে ভাবতে ও সচেতনভাবে স্বীকার করতে হবে। এই প্রবন্ধেই তিনি উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ শব্দ দু'টির পার্থক্য দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, উচ্চবর্গ— 'ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল। প্রভুস্থানীয়দের দু-ভাগে ভাগ করা যায়— বিদেশি ও দেশি। বিদেশি প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে যারা এই সংজ্ঞাসম্মত তারাও দু'ধরনের— সরকারি ও বেসরকারি। সরকারি বলতে গণ্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভারতীয় কর্মচারী ও ভৃত্য সকলেই, আর বেসরকারি বলতে গণ্য বিদেশিদের মধ্যে যারা শিল্পপতি, বণিক, অর্থব্যবসায়ী, খনির মালিক, জমিদার নীলকুঠি চা-বাগান, কফিক্ষেত বা ওই জাতীয় যে সব সম্পত্তি প্লান্টেশন প্রণালীতে চাষ করা হয় তার মালিক ও কর্মচারী, খ্রিষ্টান মিশনারি, যাজক পরিব্রাজক ইত্যাদি।'[২৪] অন্যদিকে, 'শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষি ও প্রায়-গরিব মাঝারি নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য।'[২৫] তাছাড়া ঔপনিবেশিক সমাজে প্রভু ও অধীনের সম্পর্ক যাদের জীবনে খুবই প্রকট

অথচ যারা আমাদের ইতিহাস-চিন্তায় এখনও প্রায় অনুপস্থিত সেই আদিবাসী, নিম্নবর্ণ ও নারীদের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ করে ভাবতে ও লিখতে হবে। রণজিৎ গুহ ঘোষণা করলেন— 'আমরা এমন ইতিহাস চাই যার মধ্যে মেয়েরা অতীত সমাজের তথ্যকণিকা মাত্র নয়, যার মধ্যে তারা ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকৃত।'[২৬] তিনি নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় গণসমাবেশের ও নিম্নবর্গের অর্থনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে ভাববার কথা বললেন। গায়ত্রী চক্রবর্ত্তী স্পিভাক জোর দিলেন নিম্নবর্গ অর্থাৎ প্রান্তিকের নির্মাণ বা তার মনন, তার চেতনার উত্তরণ মূলত উচ্চবর্গের বা ক্ষমতাধারীর 'অপর' (other) হিসেবে চিহ্নিতকরণে ও অনুসন্ধান চালানোয়।

নিম্নবর্গ ঃ সংজ্ঞা ও লক্ষণ

'সাবঅলটার্ন (Subaltern) শব্দটি একসময় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে অধস্তন আধিকারিকদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হত, বহু আগে শব্দটি ন্যায়শাস্ত্রে প্রতিজ্ঞা অর্থে প্রযুক্ত হত। তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত। সাধারণ অর্থে ইংরেজিতে এর সমার্থক শব্দ হল 'Subordinate'. মার্কসীয় আলোচনায় 'সাবঅলটার্ন' শব্দটি অন্য তাৎপর্য নিয়ে হাজির হলো ইতালীর কমিউনিষ্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির (১৮৯১-১৯৩৭) বিখ্যাত 'প্রিজন নোটবুকস্'-এ (১৯২৯-১৯৩৫)। এই বই সম্পর্কে কোলকাওঙ্কি জানাচ্ছেন— 'Which Constitutes one of the most original Contributions to twentieth Century Marxism'.[২৭]

'রাষ্ট্র (Political Society) জনসমাজ (Civil Society) সম্পর্কিত আলোচনায় গ্রামশি 'Subaltern' শব্দটি সংজ্ঞায়িত করেন। অনাধিপত্যলিপ্ত বর্গ বা শ্রেণীকেই গ্রামশি 'Subordinate', 'Subaltern' (ইতালিয়তে সুবলতের্ণো) বলেছেন। কখনও বা বলেছেন 'Instrumental'।

গ্রামশি প্রণীত সাবঅলটার্ন ইতিহাস প্রকল্পের সংজ্ঞা থেকেই একথা স্পষ্ট যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অধস্তন শ্রেণীসমূহ 'রাষ্ট্রে' রূপান্তরিত হতে না পারছে ততক্ষণ তাদের পক্ষে একীভূত সংহত কোনো রূপ অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব তাদের ইতিহাস জনসমাজের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যায়, আর সেইভাবে রাষ্ট্রের ইতিহাস ও রাষ্টপুঞ্জের ইতিহাসের সঙ্গেও। তাই আমাদের চর্চা করতে হবে অধস্তন শ্রেণীর ইতিহাস। সুতরাং ইতিহাসের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েও তাকে অতিক্রম করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে যে সচেতন, সংগ্রামী মানুষ. গ্রামশির তথাকথিত বিষয়মুখী দর্শন প্রাধান্য দিয়েছিল তাকেই।

গ্রামশি কথিত 'সাবঅলটার্ন', তত্ত্বধারণা নিশ্চিত ভাবেই ছুঁয়ে যায় আমাদের দেশের ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, দৃষ্টিকোণ, আদর্শ এবং বিশ্বাস-সংস্কারকেও। আমাদের দেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশে, যেখানে বুর্জোয়া বিপ্লব ও ধনতন্ত্রের বিকাশ সুষমভাবে ঘটেনি, সেখানেও অবশ্যই রয়ে গেছে শ্রেণী বৈষম্যের আরও জটিল স্তরভেদ। শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর সমান্তরাল বিকাশের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণী-সম্পর্কের বিন্যাস কেমন হতে পাবে তা নিয়ে আশি'র দশকে ভারতীয় ইতিহাসচর্চার নতুন ঐতিহাসিকগোষ্ঠী গ্রামশির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিস'-এর চিন্তাপ্রকরণে আলোচনা করেছেন। ইতিমধ্যে দেখেছি বাংলায় 'সাবঅলটার্ন' ভাবাদর্শের প্রথম ব্যাখ্যা করেন ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ এবং তিনি এই শব্দটির প্রতিশব্দরূপে 'নিম্নবর্গ' কথাটি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

Concise Oxford Dictionary-তে 'Subaltern' শব্দটির অর্থ দেওযা হয়েছে 'of inferior rank', কিন্তু এই অর্থ এর গ্রহণযোগ্যতাকে দূবাযিত করে। বরং 'Subaltern' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'নিম্নবর্গ' সর্বার্থে গ্রহণযোগ্য। 'সাবঅলটার্ন' কথাটির বিপবীতে 'elite' অভিধাটি তার শ্রেণীগুরুত্ব নিয়ে হাজির থাকে। 'এলিট' সংজ্ঞাটি সাবঅলটার্নতত্ত্বে 'dominant groups' অর্থে বিবেচিত

হয়। এই 'এলিট' গোষ্ঠীর বিপরীতে যে সাবঅলটার্ন জনগোষ্ঠী তাদের প্রগাঢ় ও প্রবহমান সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে আছে তাদের বর্গীয় পরিচয় অশোক সেন 'Subaltern Studies (V)' গ্রন্থে জানাচ্ছেন এভাবে— 'The term subaltern is used to denote the entire people that is subordinate in terms of class, caste, age, gender and office, or in any other way'[২৮] ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুমিত সরকার 'সাবঅলটার্ন' সংজ্ঞাটিকে তিনটি সামাজিক বর্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন—"I am employing the term 'Subaltern' as a convenient short hand for three social groups; tribal and low-caste agricultural labours and share croppers; landholding peasants, generally of intermediate caste status in Bengal (together with their Muslim counterparts); and labour in plantations, mine and industries (alongwith urban casual labour)"[২৯]

'সাবঅলটার্ন' শব্দটি দ্ব্যর্থক বলে অনেকে মনে করেন। সরলার্থে সাবঅলটার্ন মানে শ্রমিক শ্রেণী— সেদিক থেকে এটি প্রোলেটারিয়াট-এর প্রতিশব্দ। যার উল্টোদিকের অবস্থানে থাকে বুর্জোয়জি। এর পিঠোপিঠি অনুষঙ্গে আসে 'হেগেমনি'র কথা, যার অর্থ সামগ্রিক সামাজিক এক কর্তৃত্ব, বুর্জোয়াশ্রেণী যা প্রশাসন প্রভুত্বের সঙ্গে কায়েম করে।

গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' সংকলন গ্রন্থে ভূমিকা অংশে 'সাবঅলটার্ন' শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে— ''সাধারণ অর্থেও 'সাবঅলটার্ন' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে গ্রামশির লেখায়। কেবল পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বেও 'সাবঅলটার্ন' শ্রেণীর কথা বলেছেন গ্রামশি। স্পষ্টতই এখানে 'সাবঅলটার্ন'-এর অর্থ শিল্পশ্রমিক নয়। বরং যে-কোনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতা বিন্যাসের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উঠেছে এখানে। এই বিন্যাস কে গ্রামশি দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে, যার এক মেরুতে অবস্থিত প্রভুত্বের

অধিকারী 'ডমিন্যাণ্ট' শ্রেণী, অপর মেরুতে যারা অধীন সেই 'সাবঅলটার্ন শ্রেণী।''[৩৮]

'সাবঅলটার্ন' ইতিহাসতত্ত্বে লোকায়ত মানুষের জীবনযাপন ও জীবনসংগ্রাম এবং চিন্তা ও চেতনার ফলশ্রুতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কাজেই 'সাবঅলটার্ন' ইতিহাসচর্চা ও চিন্তার তাত্ত্বিক কাঠামোই শুধু শিল্পশ্রমিক শ্রেণীচেতনায় আবদ্ধ নয়। বরং এই ইতিহাসতত্ত্ব লোকায়ত-- নিম্নবর্গ জনগণের চেতনাকে, প্রাণসম্পদকে গভীরভাবে অনুধাবনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। লোকায়তদর্শন মানে জনসাধারণের দর্শন অর্থাৎ সমাজের উঁচুতলার মানুষের স্বার্থে তা পরিকল্পিত নয়। প্রতাপ ও জ্ঞানের যুগলবন্দি পরিহার করে অন্তেবাসী বা নিম্নবর্গীয় জনতার বহু প্রজন্মব্যাপী উপলব্ধি থেকে এর সৃষ্টি।

'সাবঅলটার্ন' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি প্রয়োগ করা হলেও এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে 'দলিত' বা 'পিছড়ে বর্গ' শব্দ দুটি সাবঅলটার্ন কথাটির সঙ্গে কতখানি সম্পৃক্ত বা সঙ্গত? আপাতভাবে 'দলিত' বা 'পিছড়ে বর্গ' সাবঅলটার্ন শব্দের ক্ষেত্রে অপপ্রযুক্ত। কেননা, এই দুটি শব্দ গড়ে উঠেছে জাত-পাতের রাজনীতির (Caste-Politics) ভিত্তিতে। 'দলিত', 'পিছড়ে বর্গ' শব্দগুলি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বরং আমরা বলতে পারি, 'ব্রাত্য' শব্দটি 'নিম্নবর্গের ধারণা'র সঙ্গে সমাজ ইতিহাসগত ভাবনায়, 'আধিপত্য' (Hegemony) ও 'প্রভুত্ব'-এর ধারণার সঙ্গে অনেকখানি সাযুজ্যপূর্ণ।

লক্ষণ ঃ ১ বিকেন্দ্রায়ণের মধ্য দিয়ে প্রতিসন্দর্ভের কার্যকরী আদল গড়ে তোলাই নিম্নবর্গীয় চেতনার লক্ষ্য।

২ নিম্নবর্গীয় রাজনীতির একটা বৈশিষ্ট্য এলিট কর্তৃত্বের প্রতিরোধ তার নিম্নবর্গের নিজের নিয়মেই এই চেতনা সুসংগঠিত হতে পারেনি। নিম্নবর্গের মানুষেরা এলিটদের কাছে বিভিন্ন ভাবে প্রতারিত প্রবঞ্চিত

লুণ্ঠিত হয়েছে, তাদের রাজনীতিতেও তাই বঞ্চনা ও লুণ্ঠনের অভিজ্ঞতা একটা বড়ো উপাদান। বঞ্চনার অভিজ্ঞতা থেকে নিম্নবর্গের রাজনীতির ইতিহাসে তৈরি হয়েছে বহুধরনের স্বতন্ত্র বাক্-রীতি ও বাগ্‌বিধি, বিভিন্ন শব্দ, পরিভাষা, নিম্নবর্গ একটা আলাদা রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দেয়।

৩ আজকাল মার্কসবাদের বহুমাত্রিক পাঠ দেখা যাচ্ছে। সে অর্থে সাবঅলটার্ন স্টাডিসও মার্ক্সবাদী। বর্তমানে মার্কসবাদকে ব্যাখ্যাব বহুত্বের এক উন্মুক্ত পরিসর ভাবা হয়, এরকম চিন্তা নব্য মার্কসবাদেব। নব্য মার্কসবাদীরাও মূল অঙ্গীকারে বিশ্বাসী, সেকারণে নব্য মার্কসবাদ সব রকম অসাম্য ও বিষময়তার বিপক্ষে, হোক তা লিঙ্গের, শ্রেণীর কিংবা জাতির। এই অঙ্গীকারের কারণেই নব্যমার্কসবাদ বুর্জোয়া-লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন। সাবঅলটার্ন স্টাডিস বা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা মুক্ত মার্কসবাদের কথা বলে।

৪ ধর্মভাব নিম্নবর্গের চৈতন্যের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। ধর্মভাব বলতে কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় সংস্থার প্রতি আনুগত্য বোঝায় না। যা পার্থিব বা ঐহিকতাকে অলৌকিক বলে ভাবা, যা একেবারেই মানবিক তাকে দৈব বলে মনে করা, এটি এই ধর্মভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিম্নবর্গেব ঐতিহাসিকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে ধর্মভাবও একটি সচেতনতা গড়ে তুলতে পারে। ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের আগে ও পরে দীর্ঘদিন মফস্বল ও গ্রামেব সাধারণ মানুষেব চোখে রাষ্ট্রশক্তি ছিল অনেক দূরের জিনিস। রাষ্ট্রশক্তিকে তারা দৈবশক্তির আধার মনে করে ও এর থেকেই তৈবি হয় এক অলীক রাষ্ট্রের ধারণা।

৫. 'Subaltern mentality' অর্থাৎ সাবঅলটার্নদের যাপিত জীবনচর্চায় দুটি দিক আছে। একদিক তার কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে, আর একদিকে করে প্রতিবাদ, বিরোধিতা। নিম্নবর্গ যখন আধিপত্য ও কর্তৃত্বের দ্বারা নিদারুণ পীড়িত হয়, তখন যে উদাহরণ (Paradigm) তারা তৈরি করে, তার ইতিহাস আর এলিটশ্রেণীর আয়ত্তে থাকে না, তখন 'The subaltern as subjects of their own histories'.[৩১]

৬. নানাবিধ ট্যাবু এবং শাস্ত্রানুশাসন সাব-অলটার্ন সংস্কৃতির একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। প্রাক্-ঔপনিবেশিককাল থেকে সাবঅলটার্ন চেতনায় নানা সংস্কার ও ধারণা এমনভাবে বদ্ধমূল থেকে আসছে যে, ভাগ্য, (destiny), মান্যতা (Subordination) ইত্যাদি বিষয় তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে।

৭. সমাজকাঠামোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাস ও পুনরাবর্তনের প্রক্রিয়াগুলিকে তাদের মৌলিক উপাদানে বিভক্ত করে দেখাই উচ্চবর্গ। নিম্নবর্গের বিশ্লেষণের লক্ষ্য।

৮. উচ্চবর্গ / নিম্নবর্গের বিশ্লেষণ পদ্ধতি উৎপাদন-রীতির ধারণাটিকে বাদ দিয়ে বলতে পারে না।

৯. উচ্চবর্গের চেতনার বিপরীত অবস্থানে নিম্নবর্গের চেতনাও কোনও না কোনও ভাবে তার স্বকীয়তা, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়।

১০. প্রভুত্ব ও অধীনতা যেমন দ্ব্যণুক বৈপরীত্যের সূত্রে বাঁধা, অধীনতাও তেমনি একটি দ্ব্যণুক সত্তা যা নিজেই আবার দুটি রাশির বৈপরীত্য দিয়ে গড়া। সেই রাশি দুটি হচ্ছে সহকারিতা ও প্রতিরোধ। নিম্নবর্গের

> ইতিহাসে দুটি রাশিই সক্রিয়ভাবে উপস্থিত, যদিও অবস্থাভেদে একটি অপরটির চেয়ে জোরদার হয়ে ওঠে এবং অধীনদের চৈতন্যে হয় একটি বা অন্যটি তার প্রাধান্য কায়েম করে সাময়িকভাবে। তাই একথা মনে করা ভুল হবে যে প্রতিরোধই নিম্নবর্গের চৈতন্যের একমাত্র উপাদান।

চেতনা' কী ? ঃ-

'চেতনা' আমাদের যথেষ্ট পরিচিত ও ব্যবহৃত শব্দ, যেমন, শিল্পচেতনা, সাহিত্যচেতনা, সমাজচেতনা, শ্রেণীচেতনা, ধর্মচেতনা ইত্যাদি। বস্তুত, প্রাগৈতিহাসিককালেও আদিম মানবসমাজে চারপাশের জীবজগৎ, জীবনকারণের সঙ্গে মানুষের নিজ সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত আছে চেতনা অন্বেষণের বীজ।

বিগত এক দশক 'চেতনা' সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ও পনেরো হাজারেরও বেশি গবেষণাপত্র বিদেশি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এই তথ্যটি ইঙ্গিত করছে সারস্বত জগতে চেতনা অতি গুরুত্বপূর্ণ, অন্যতম প্রধান বিষয়রূপে উপস্থিত হয়েছে। সায়েন্স-টেকনোলজির অসাধারণ উন্নতির কালে— যখন বার্মিংহাম থেকে বাঙ্গালোর ই-মেল মাধ্যমে কয়েক সেকেণ্ড বার্তা আদানপ্রদানে অভাবনীয় বিস্ময় অবশিষ্ট নেই— অতি পরিচিত হয়েও চেতনা এক অপার বিস্ময় ও রহস্যময় ধাঁধা।

'চেতনা' কী? 'চেতনা'-র সংজ্ঞা (definition) কী? কোথায় 'চেতনা'-র বাস? কী তার কাজ? কেনই বা তার অস্তিত্ব? সাধারণভাবে 'চেতনা' বলতে আমরা কী বুঝি? জাঁ পল সার্ত্র বলেছিলেন— 'Consciousness as a being which is what it is not and which is not what it is'[৩২] এ যেন চাঁদের মাটি কেমন হয় বিস্তর জানার পরে, ব্রহ্মাণ্ডের দূরতর কোনও জায়গায় প্রাণের

আবির্ভাব হয়েছে কিনা জানার বিশদ চেষ্টা চালানো। হঠাৎ নজরে পড়ল, ঘরের কাছে আরশিনগরে যে পড়শি বসত করে তাকেই দেখা হয় নি— খুবই চেনা হঠাৎই -প্রায় আবিষ্কৃত হল অতি অ-জানা! সে 'পড়শি' বাস করে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে, নাম তার— চেতনা (Consciousness)।

আমাদের হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনা স্মৃতি-শিক্ষা ভাবনা-চিন্তা কল্পনা-বোধ অনুভব-কর্ম, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে—অস্তিত্বের সঙ্গে—চেতনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অস্তিত্বের সঙ্গে চেতনা এমনভাবে জড়িত যে হাত-পা-মাথাবিশিষ্ট আমার এই দেহের একটি নামকরণ হয় এবং সেই নাম ও এই দেহের সঙ্গে আমি নিজেকে একাত্ম করি— এই 'আমি'-র সঙ্গে আমার দেহ ও নাম অভিন্ন হয়ে ওঠে আমারই চেতনায়— এই আত্মচেতনা (self-consciousness) ও চেতনাব জগৎ। বস্তুত, চেতনা আছে বলেই আমি আছি— চেতনা না থাকলে জানবই না আমি আছি, আমরা আছি, ছিলাম বা থাকব।

চেতনার সংজ্ঞা (definition) আজকের বিজ্ঞানে নেই। সংজ্ঞা না হোক্, সুনির্দিষ্টকরণের প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরে শুরু হয়েছে চেতনার ক্ষেত্রে। সচেতন অর্থ প্রাণ আছে, জীবিত প্রাণী— চেতনার অর্থ প্রাণ। আবার, ডাক্তাররা যখন বলেন রোগী 'অজ্ঞান'— 'আনকনশাস'— সে ক্ষেত্রে দেহে প্রাণ থাকলেও সাড়া দেবার ক্ষমতা নেই, অর্থাৎ, চেতনার অর্থ তখন সংবেদনশীলতা ও প্রতিক্রিয়া। অনুভূতি চেতনার অন্তর্গত কিন্তু অনুভব ও চেতনা একার্থ হলেও এক নয়। স্থান-কাল-সমাজ-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিত চেতনায় সবিশেষ বর্তমান।

চেতনার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে আছে বিষয়গত অভিজ্ঞতা যার অন্তর্ভুক্ত এক গুণগত অনুভব (qualitative feel) — চেতনা সেই রকম বিষয় যা বিজ্ঞান দ্বারা জানাব কথা নয়, বিজ্ঞান বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় তার বিষয় নয় চেতনা। এই যুগের বিজ্ঞানের প্রশ্ন, 'চেতনা' কী? এর পরে এই প্রশ্নের সম্মুখীন

হতে হবে, মানব—সচেতন মানুষ— বলতে কী বুঝি? চেতনার ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হচ্ছে বিশ্বাস ও যুক্তির সম্পর্ক সমন্বয়ের এবং পরিপূরকতার। চেতনার ক্ষেত্রে বিশ্বাস আগে, যুক্তি পরে। চেতনা গবেষণায় এসে আমরা অনুধাবন করছি যে অনুভূতি দ্বারা যা জানা যায় তা বিশ্লেষণী যুক্তিতে প্রকাশ বা প্রতিপন্ন করা অনেকসময় সম্ভবপর হয়ই না এবং তা সম্ভব না হলেও সেই জানা-জ্ঞান— সর্বাংশে সত্য হতে পারে অবশ্যই। এই 'আমি'— যা পরিবার-পরিবেশ-সমাজ ক্রমশ বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত হতে হতে মহা- 'আমি' হয়ে বিরাজ করবে। এই 'আমি'র ব্যষ্টি চেতনা সমষ্টির মহা-'আমি'-তে একাত্মতা বোধ করবে এবং পরিণতিতে ব্যক্তি-সমাজের অন্তঃসম্পর্ক এবং সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে। মানুষের বেঁচে থাকা, বিকশিত হওয়ার আকাঙ্খা সহজাত, ঐকান্তিক— তার সঙ্গে দুর্মর আকুলতা নিজেকে ছাপিয়ে বৃহত্তর ও উচ্চতর চেতনার জগতের দিকে যাত্রার। বেঁচে থাকা ও বিকশিত হওয়ার আকাঙ্খা আমার যেমন, দুঃখ-কষ্টর অনুভব আমার যেমন অপরেরও তেমন হওয়া স্বাভাবিক। 'বীইং অ্যাণ্ড ন্যাথিংনেস'- এ সার্ত্র বলেছেন যে স্ব-হেতু সত্তা (Being for itself) অপরিহার্যভাবেই অন্য-হেতু সত্তাকে (Being-for-others) সূচিত করে। কারণ ব্যক্তি একা একা কখনই অস্তিত্বশীল হতে পারে না। অন্যের সম্পর্কে সম্পর্কিত বা অবহিত না হয়ে আমার পক্ষে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। সার্ত্রের মতে অস্তিত্ব সর্বদাই সামাজিক। মানুষ যদি অন্যকে এড়িয়ে চলে তবে তার কারণ অন্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে অচেতনা নয়, বরং অন্যদের সম্পর্কে তার চেতনা এতই তীব্র যে সে আর অন্যদের শারীরিক উপস্থিতি করতে পারছে না। যদিও সার্ত্রের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সামাজিক-অস্তিত্বে-ব্যক্তিমানুষ। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ প্রথম থেকেই ক্রিয়াশীল। কেবলমাত্র কর্মেই অস্তিত্ব মূর্ততা ও পূর্ণতা লাভ করে। অস্তিত্বশীল হওয়া মানেই কোনো না কোনো কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। কর্মের একটা আভিমুখ্যতা রয়েছে, রয়েছে উদ্দেশ্যাভিমুখিনতা। কর্মের এই আভিমুখ্যতা

ও উদ্দেশ্যাভিমুখিনতা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের 'চেতনা'-য় প্রতিফলিত ও রূপান্তরিত হয়।

জীবনঘনিষ্ঠ মানবতাবোধ একজন শিল্পীর বড় মাপকাঠি। কারণ এই জীবন ঘনিষ্ঠতা থেকেই জন্ম নেয় সমাজমনস্কতা, যে কোনো চেতনা। গবেষণা-সন্দর্ভে উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট চারজন গল্পকারেরা জীবনঘনিষ্ঠ মানবতাবোধের স্বার্থেই নিম্নবর্গীয় চেতনার সংকেতবিশ্বকে উন্মুক্ত করেন।

নিম্নবর্গীয়চেতনা ঃ-

নিম্নবর্গীয় ইতিহাসতত্ত্ব গুরুত্ব আরোপ করে যে, নিম্নবর্গের চেতনার আলোকে নিম্নবর্গকে বুঝতে হবে। এখানেই প্রশ্ন আসে, নিম্নবর্গের বা 'নিম্নবর্গীয় চেতনা'টা তাহলে কী? 'নিম্নবর্গ' শব্দ ব্যবহারের হেতু কী? 'নিম্নবর্গ' শব্দের পরিবর্তে মার্ক্সীয় তত্ত্বের 'শ্রেণী' শব্দটা বসালে অসুবিধে কোথায়? শেষ দু'টি প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়েছেন গৌতম ভদ্র,— "...শ্রেণীর সামাজিক বাস্তব ভিত্তি অস্তিত্বের প্রাথমিক শর্তমাত্র। শ্রেণীসচেতনতার বিকাশ একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। ভারতীয় সমাজে চৈতন্যের ক্ষেত্রে এই সচেতনতা অনেক সময়ই অনুচ্চারিত থাকে। বর্ণ, গোষ্ঠী, ধর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে কর্তৃত্বের দাবিকে নাকচ করা হয়। বারবার নানা কারণে শ্রেণীসচেতন নেতৃত্ব গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়, বারবার নয়া গণতন্ত্রের স্বপ্ন হারিয়ে যায়। ফলে শ্রেণীর পরিবর্তে নিম্নবর্গ অনেক দ্যোতনাময়।"[৩৩] নিম্নবর্গের চেতনার সন্ধান জানা যায় নানা জটিল বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে। আমরা সেই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকে এভাবে সাজিয়ে দেখতে পারি—

(১) সাবঅলটার্ন স্টাডিসের লেখকেরা 'চেতনা'-কেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি, গুরুত্ব দিতে গিয়ে ব্যক্তির অস্তিত্বকে উপেক্ষা করেছেন অথচ 'চেতনা' সবসময়েই অবজেকটিভ, ঐতিহাসিক শক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট— এরকম অভিযোগ

আমাদের দেশের কোনো কোনো সমাজতাত্ত্বিক করে থাকেন।[৩৪] যদিও এই অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে একমাত্রিক মার্কসবাদ।[৩৫] আজকের বহুমাত্রিক মার্কসীয় বীক্ষায় নিম্নবর্গীয়চেতনার সংকেতবিশ্বে যা প্রতিফলিত হয় তা এরকম— নিম্নবর্গের নিজস্ব রাজনীতি রয়েছে, সংস্কৃতিও তাদের ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। নিম্নবর্গের ইতিহাসে রাজনৈতিক সক্রিয়তার এক স্বাধীন রূপকল্প পাওয়া যায়। নিম্নবর্গের রাজনৈতিক সক্রিয়তা কেবলমাত্র উপনিবেশবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয়, বরং এই সক্রিয়তা তাদের মধ্যে এসেছে একধরণের আদর্শবাদ থেকে, ক্ষমতা— সম্পর্কের প্রভাব থেকে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের অ-প্ররোচিত, স্বতঃস্ফূর্ত ও উন্মুক্ত চেতনাকে গুরুত্ব দেওয়া যেমন কর্তব্য, তেমনই সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ সমানভাবে বিবেচ্য।

২) অর্থনীতিবিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানী অজিত চৌধুরী সাবঅলটার্ন চেতনাকে হেগেলীয় চেতনা ও লুকাচের চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বুঝতে চেয়েছেন একটি প্রবন্ধে।[৩৬] সেই প্রবন্ধে তিনি অধ্যাপক রণজিৎ গুহ কৃত প্রকল্পের মতাদর্শগত প্রভুত্বের স্বরূপ আলোচনা করে বোঝাতে চেয়েছেন যে বিদ্রোহী কৃষক কেমন করে এই মতাদর্শগত প্রভুত্ব ভাঙে। মতাদর্শগত প্রভুত্বের ওপরে ওঠা মানেই সচেতন হওয়া। মতাদর্শগত প্রভুত্ব যেহেতু চেতনার জগতেরই একটি ধারণা, সুতরাং গ্রামশির 'চেতনা'-র ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে অধ্যাপক চৌধুরী ভাবতে চেয়েছেন। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যায় যাব।

৩) উচ্চবর্গের চেতনার বিপরীত অবস্থানে নিম্নবর্গের চেতনাও কোনও না কোনওভাবে তার স্বকীয়তা, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়। উচ্চবর্গ/ নিম্নবর্গ সম্পর্কের মধ্যে দুটি চেতনার স্বাতন্ত্র্যও যেমন সত্য, উচ্চবর্গের প্রভুত্ব ও নিম্নবর্গের অধীনতাও তেমনি সমানভাবেই সত্য। অর্থাৎ নিম্নবর্গের চেতনা স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন। এই দ্বান্দ্বিক রূপটিকে অবলম্বন করেই নিম্নবর্গের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। অধিকাংশ সময়ই নিম্নবর্গকে দেখা যায় নিষ্ক্রিয়,

ভীরু, একান্ত অনুগত একটি জীব হিসেবে। অন্যে চালিত করলে তবেই যেন সে চলে। একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়ই শাসকগোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রাহ্য করে। এই ধরনের ঐতিহাসিক বিবরণগুলির মধ্য থেকে নিম্নবর্গের চেতনার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য-পরাধীনতার দ্বৈত চরিত্রটি উদ্‌ঘাটন করাটা নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার একটা বিশেষ দিক হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

৪) সাবঅলটার্নপন্থীরা ধর্ম ও শ্রেণী সহাবস্থানের মধ্যে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনার আধার দেখছেন। শোষক ও শোষিতের কাছে ধর্মের অর্থ ভিন্ন। উচ্চবর্গের কাছে পরাজয়ের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হওয়া থেকে মুক্তি এবং ক্ষমতা করায়ত্ত করার পথ নিম্নবর্গ খুঁজে পায় ধর্ম বিশ্বাসে। রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে অবলম্বন করে মানুষের অর্ন্তলোকে মানবচেতনার বিকাশকে সংঘটিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, ধর্ম হলো মানবতাবাদে উন্নীত হওয়ার অন্যতম পন্থা। এই চেতনার নিহিত তাৎপর্য সন্ধান করতে পারি জাঁ-পল-সার্ত্রের উচ্চারণে- "A pure consciousness is an absolute simply because it is consciousness of itself, it remains accordingly a "phenomenon" in the very special sense in which "to be" and "to appear" are one. It is entirely lightness, entirely translucence."[৩৫]

৫) নিম্নবর্গের চেতনার নিজস্বতা গড়ে ওঠে অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে। দৈনন্দিন দাসত্ব, শোষণ আর বঞ্চনার মধ্যে নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। সাধারণ অবস্থায় নিম্নবর্গকে সেখানে কেবল প্রভুর আদেশ পালন করতেই দেখা যায়। একমাত্র একটি মুহূর্তেই শাসককুলের মানসপটে নিম্নবর্গ আর্বিভূত হয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে। সেই মুহূর্তটি হল বিদ্রোহের মূহূর্ত। নিম্নবর্গ যখন বিদ্রোহী, তখনই হঠাৎ শাসকবর্গের মনে হয়, দাসেরও একটা চেতনা আছে। এই চেতনাই আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের অন্যতম অন্বিষ্ট।

'আধিপত্য' ও 'প্রভুত্ব' এবং গ্রামশি

এর্নষ্ট ব্লক অবশ্য মানুষের ইতিহাসকে বর্ণনা করেছেন এমন একটি ঘর হিসেবে 'Which has more staircases than rooms' (১৯৯০:১১৪)। প্রকাশ্য স্তর ও পর্যায় কে ঘিরে আছে যে সমস্ত প্রচ্ছন্ন স্তর ও পর্যায়— তাদের আবিষ্কার করতে সাহায্য করে নিম্নবর্গীয় চেতনা। প্রতাপের অভিব্যক্তি, কার্যকারিতা ও সম্পর্কের বিন্যাস বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝে নিতে পারি, কী পদ্ধতিতে গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক প্রতিবেদন, আর এই প্রতিবেদন কোন পদ্ধতি বা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তা সাহিত্যিক পাঠকৃতি মুখ্য আধেয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। ফুকোর অবিস্মরণীয় উক্তি আমাদের এই বিষয়কে বুঝতে আরো সাহায্য করে— 'Power is everywhere, not because it embraces everything, but because it comes from everywhere' (১৯৮৪:৯৩)। এই মন্তব্য আমাদেব অভিজ্ঞতায় ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কেননা আমাদের বহুধা বিভক্ত সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্গীয়দের প্রান্তিকায়িত অবস্থান জলের মতো স্বচ্ছ। এযাবৎ আমাদের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক যে প্রতিবেদন গড়ে ওঠেছে তা মূলত আধিপত্যবাদীবর্গেরই সোচ্চার ঘোষণা। শূদ্র, অনার্য, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিগত অনুন্নত সম্প্রদায় এমনকি নারীদের জন্য পৃথক কোনো পরিষদ উল্লিখিত। ঋগ্বেদ থেকেই শুরু হয়েছে নারীর অপ্রকাশ্য সামাজিক পরিসরের বাস্তবতা। আমরা প্রত্যেকেই কার্ল মার্কসের সেই জ্ঞানগর্ভের ভাষ্যেব কথা জানি— 'ক্ষমতাবানদের দুর্বলতা নয়, দুর্বলদের ক্ষমতায় উত্তরণই ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যায়।'[৩৮]

আসলে, মার্কসবাদ আমাদের সর্বাঙ্গীন জীবনদর্শনের পাঠ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে। মার্কসবাদ প্রকৃত অর্থে 'attitude to life'। এই জীবনদর্শন বুর্জোয়া জীবনদর্শনের বিপরীতে অবস্থান করে। মার্কসীয় জীবনদর্শনের মূল প্রত্যয়টি হলো—প্রত্যেকটি মানুষের নানান ক্রিযাকর্মে— রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা

সাংস্কৃতিক— স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এই পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ যেহেতু এর প্রাথমিক দাবি, সেহেতু বৃহত্তর গণমানসে সামাজিক সচেতনার উন্মীলন এর নির্বিকল্প পূর্বশর্ত। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও জনমানসে নতুন জীবন প্রত্যয়ের প্রত্যাবর্তন— এই ভাবান্তরের দ্বিবাচনিকতায় সমাজতন্ত্রের অগ্রগমণ ও উত্তরণ। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ— এমন এক সমাজব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতার ভিত্তিগুলি— জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ, শ্রম বিকেন্দ্রায়িত থাকবে।

'কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের মূল প্রতিপাদ্যই হলো 'Class struggles'। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের শেষের দিকে মার্কস কথিত শ্রেণীধারণটি (Class Concept) অনেকখানি প্রতিভাসিত হয়েছে। মার্কস জানিয়েছেন পুঁজিবাদী সমাজে তিনটি বৃহৎ শ্রেণী রয়েছে— শ্রমিক, পুঁজিপতি এবং জমির মালিক (Wage labour, Capitalists and land owners) কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত দুটি শ্রেণী (bourgeoisic and proletariat) প্রধানতঃ এখানে তিনটি শ্রেণীতে নির্দেশিত। শ্রেণীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে মার্ক্স দ্বান্দিক ও গতিশীল চেতনার কথা বলেছেন। একশ্রেণী অপর সামাজিক গোষ্ঠীর ওপর তাদের চিন্তা-চেতনা চাপিয়ে দেয়।

এইভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামে একশ্রেণী অপর শ্রেণী বা শ্রেণীগুলির ওপর আধিপত্য ও প্রভাব চালিয়ে যায়। মার্কসীয় অর্থনীতিবাদজাত শ্রেণীভাবনা থেকে এই সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চিরচলিষ্ণু। ফলত শ্রেণী সম্পর্কের বিন্যাসেও সর্বদা ভাঙচুর ঘটে। কখনও আধিপত্য স্বীকার, কখনও প্রতিবাদ আবার কখনও অস্থায়ী যুদ্ধ। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনসমাজ (Civil Society) এই সম্পর্ক বিন্যাসের নতুনতর অভিজ্ঞতা লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের নানান গোষ্ঠীর মধ্যে দিয়েই সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশ পাচ্ছে। এইখান থেকে মার্কসীয় শ্রেণীভাবনা বর্গ/গোষ্ঠী (group) সম্পর্কিত ধারণায় প্রসারিত হলো। বিশেষত

আন্তোনিও গ্রামশির 'Prison Notebooks'- এ। রাষ্ট্র যে শ্রেণী আধিপত্যের হাতিয়ার, এই বুনিয়াদী মার্কসীয় তত্ত্বকে ভিত্তি করেছেন গ্রামশি। এর থেকেই তিনি শ্রেণীনেতৃত্ব ও শ্রেণী শাসনের দুটি পৃথক দিকের উল্লেখ করেছেন— আধিপত্য (hegemony) এবং প্রভুত্ব (domination)।

আমরা জানি যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভুত্ব বা পশুবলের সূচক। এমন একটি ধারণাকে ভিত্তি করেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথাগত মার্কসীয় ব্যাখাটি গড়ে উঠেছে— অর্থাৎ বুর্জোয়া প্রভুত্বের বদলে এক বিকল্প শ্রমিক শ্রেণীর প্রভুত্ব কায়েম করাই হয়ে দাঁড়ায় সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য। মার্কসীয় ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রকে সচরাচর দেখা হয় উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে জনগণের সামঞ্জস্যবিধানেব দমনমূলক যন্ত্র হিসেবে। গ্রামশি প্রচলিত এই মার্কসবাদী ধারণার পাশাপাশি এক নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর বিচারে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি প্রভুত্ব বা পশুশক্তি নয়, তাঁর মতে, রাষ্ট = আধিপত্য + প্রভুত্ব, অর্থাৎ, পুরসমাজ + রাজনৈতিক সমাজ। অর্থাৎ সম্মতি ও পশুবলের এক জটিল সমাহার।

দুনিয়ার রামপন্থী মহলে গ্রামশি-চর্চা জোরদার হলো ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভ কর্তৃক নিস্তালিনীকরণের (de-stalinisation) পর থেকে। আজও তা অব্যাহত রয়েছে। গ্রামশি মার্কসবাদী ছিলেন, কিন্তু গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারাই ইতিহাসেব ধারা সব সময়ে প্রবাহিত হয়— এই বিশ্বাস গ্রামশির ছিল না। উচ্চবর্গ কেবল শক্তির মাধ্যমেই নিম্নবর্গকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, গ্রামশি বিশ্বাস করেন না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাব মাধ্যমে উচ্চবর্গ তার 'আধিপত্য' (hegemony) বজায় রাখে। গ্রামশি মনে করেন, 'আধিপত্য' ও 'দমননীতি' দুটি বিচ্ছিন্ন বা বিরোধী প্রক্রিয়া নয়। বরং পরস্পর সহযোগী।

সমাজে ক্ষমতার গঠন প্রক্রিয়াকে গ্রামশি তিনটি পরিসবে ভাগ করে

দেখেছেন। বাস্তবে তাদের ওতপ্রোত সম্পর্কে ক্ষমতার অধিষ্ঠান। ঐ পরিসর তিনটি হলো রাষ্ট্র, অর্থনীতি (উৎপাদন ব্যবস্থা) এবং নাগরিক সমাজ। নাগরিক মানে কেবল নগরবাসী নয়। তার সঙ্গে যুক্ত সবরকমের অধিকার যা সামাজিক মানুষকে নাগরিকের স্বীকৃতি দেয়। সে নাগরিক শহরবাসী বা গ্রামবাসী যাই হোক না কেন। রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের এক্তিয়ারের বাইরে বিভিন্ন সংস্থা বা সমিতির গঠন ঐ অধিকারের গোড়ার কথা। তাদের আয়ত্তে থাকে সমাজের বিন্যাস ও যোগসূত্র। এমনকি রাষ্ট্রের কার্যক্রম স্থির করার ক্ষেত্রেও ঐসব সংস্থার ভূমিকা আছে। এমন সব অধিকার বিশিষ্ট মানুষ নিয়েই নাগরিক সমাজ। বলপ্রয়োগের দিকে অর্থাৎ প্রভুত্ব (ডমিনেশন) ছাড়াও শ্রেণীশাসন ও প্রতিপত্তির অন্য এক বিশেষ দিককে গ্রামশি উল্লেখ করেছেন। সে দিকটি হলো, 'আধিপত্য' (হেজেমনি)। এ হলো আসলে নাগরিক সমাজে প্রাধান্য বিস্তার। প্রাধান্যের বিবেচনায় গ্রামশি নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সে কারণে স্বতন্ত্র এক পরিসরের কথা উঠছে।

গ্রামশি তাঁর 'Prison Note Book'- এ নাগরিক সমাজকে 'আধিপত্য'-এর ধারণাকে গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করেছেন। এই আলোচনায় গ্রামশি চিন্তার ভগীরথ অশোক সেন যা সন্ধান করে পেয়েছেন তা হলো— ''তাঁর আলোচনায় তেমন অনুমোদনের সামাজিকতাই নাগরিক সমাজের গূঢ় সত্য এবং প্রধান অবলম্বন। তাই সম্মতি সমর্থনের অবস্থানকে পুঁজির পক্ষ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে উল্টে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সে প্রয়োজন পূরণের জন্য গ্রামশির কর্মকাণ্ডের দর্শন পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষায়, লোককথা, জনসংস্কৃতির অবলোকনে, অঙ্গীকারে, নৈতিক সাংস্কৃতিক সংগ্রামে নিবিষ্ট হতে চায়।''[৩৯] ইতিহাসের যে জটিল কাল পর্ব জুড়ে আনতোনিও গ্রামশির জীবন ও চিন্তা পরিব্যাপ্ত ছিল, তার সঙ্গে আজকের সময়ের ব্যবধান অনেকখানি। কিন্তু সময়ের দূরত্ব তাঁর চিন্তাব সজীবতাকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি।

নিম্নবর্গ— সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা

নিম্নবর্গীয়দের জীবনই সমস্ত ধরণের সংস্কৃতির প্রকৃত ভিত্তিপীঠ। মানুষের সামাজিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বিশেষ ভাবে শ্রেণীসংগ্রাম তার বিভিন্নরূপে মানুষের জ্ঞানের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং শ্রমজীবি শ্রেণী নিজস্ব সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি স্থির না করতে পারলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাও করতে পারবে না। কাজেই আমাদের দেশের নিম্নবর্গজনের সংস্কৃতির স্পষ্ট পুনরুত্থান, প্রসার দরকার। ভূমিবদ্ধ মানুষদের সমাজে যে সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আজও পালন করা হয়, সেইগুলির অধিকাংশই জীবনমুখী ও লৌকিক। শ্রমজীবী মানুষজনের যে ঐক্য আবহমান কাল ধরে কখনও পরাজয়ে কখনও বিজয়ে বেদনা উল্লাসে ভাঙে-গড়ে, তার অনুপুঙ্খ বীক্ষণ আজ যেমন জরুরি হয়ে পড়েছে ঠিক সেই রকম এই আবহমানকালের ইতিহাসকে বাংলা সাহিত্য কতখানি ধারণ করতে পেরেছে বা বাংলা সাহিত্যে তা কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তারও অনুসন্ধান সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির অনুধাবনে বিবেচনাযোগ্য।

বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনার ক্রমবিকাশ ঃ বিশেষ পাঠ—'ছোটগল্প'

স্বদেশে ও সবকালে মানব সমাজ হয়েছে সূচীমুখ তার সদস্যদের মধ্যে অনুগ্রহ ও বঞ্চনা বিতরণে। কিছু ব্যক্তি সিংহভাগ ভোগ করে সম্পদ। আয়, প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের; সাধারণত উৎপাদনশীল সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ মারফতে। এই সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা নানা রকমের, যেমন পৈত্রিক সম্পত্তির সম্ভ্রান্ত উত্তরাধিকারী, উচ্চবর্ণের অধিপতি, কৌমার পুরোহিত, পরিচালক-আমলা, ব্যবসায়ী অলস ধনীক গোষ্ঠী বা এসব গোষ্ঠীর সম্ভাব্য সমবায়। ঐ একই নিদর্শনে প্রত্যেক সমাজের অধোভাগে আছে অগুন্তি নিঃস্ব মানুষ যারা পরিতুষ্টির নিম্নতম ভাগ পেয়ে থাকে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাও না। এরা হ'লো দাস, ভূমিদাস, পিওন, বর্গাদার, কৃষক, অন্ত্যজ, প্রাকৃতজন তথা নিম্নবর্গের মানুষ। সকল দেশে

ও সকল সময়ে তাদের অভিন্নতায় রয়েছে দারিদ্র্য, নীচুমান ও সামাজিক সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব বিস্তারের অক্ষমতা।

'পৃথিবীর সমাজব্যবস্থার প্রথম স্তর থেকেই অমারা দেখে আসছি যে, সমাজ মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত— এক শ্রেণীতে সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনী, অন্য শ্রেণীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্ধন। যারা দরিদ্র অবজ্ঞাত, অপাঙ্‌ক্তেয়, মুখ্যত তারাই 'নিম্নবর্গ' আখ্যায় ভূষিত। কিন্তু আমাদের সমাজের প্রাচীন ব্যবস্থার প্রতি একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে ধনই মানুষের শ্রেণী বিভাগের একমাত্র মাপকাঠি নয়। আমাদের সমাজ নানা শ্রেণীর মানুষে গঠিত। এই শ্রেণীবিভাগ গোড়ায় জন্মগত ছিল না, পরে জন্মগত হয়ে যায়। জন্মগত শ্রেণীবিভাগে কেউ বা ব্রাহ্মণ কেউ বা শূদ্র। এই শ্রেণী বা বর্ণ বিচারের দিক্ থেকে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি জাতি চিরকালই নিম্নবর্গের মানুষ অপেক্ষা সমাজে একটি উচ্চ স্বতন্ত্র স্থান পেয়েছে।

'বর্ণাশ্রম ধর্ম যখন এদেশে প্রভুত্ব করেছে তখন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। সে-ভাষার উপর নিচুতলার মানুষের অধিকার ছিল না। সেই অধিকার পেতে নিচু তলার মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এ-কথা রামায়ণে আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে সংস্কৃত সাহিত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেই মধ্যযুগে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম হয়। রামদাস, কবীর, নানক, দাদু, নাভা প্রমুখের জীবন আমাদের এসব জানতে সাহায্য করেছে। দক্ষিণ ভারতের দার্শনিক রামানুজ থেকে বাংলার শ্রী চৈতন্যদেব উচ্চশ্রেণীর মানুষ হয়েও নিম্নবর্গের ধারাকে আরোও পুষ্ট করেছেন। অথচ আমাদের গতানুগতিক প্রথাবদ্ধ ইতিহাস চর্চার দৃষ্টিভঙ্গি এই শিক্ষা দিয়েছে যে. ভারতবর্ষের ইতিহাসের উৎসমুখ আর্যসভ্যতা। ভারতবর্ষের এবং ভারতীয় জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই আর্যসভ্যতার দান ও তারই উত্তরাধিকার। এরকম শিক্ষা ও ধারণা আমাদের শৈশব থেকেই লালন করে বেড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু খ্রি:পূ: ১৫০০ অব্দে আর্যজাতির আগমনের পূর্বে যারা ছিল অরণ্যসংকুল প্রত্ন-ভারতের অধিবাসী,

তাদের জীবনযাত্রা, ধর্মবোধ, বিশ্বাস-সংস্কার, সামাজিক আচার-আচরণ এসব বিষয় আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। ভারতবর্ষের মূল আদিম অধিবাসী— অনার্য সভ্যতার ইতিহাস অজানাই থেকে যায়। আর্যজাতিরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অনার্যজাতির সমস্ত আচার-আচরণ অভ্যাসকেই 'অসভ্য-বর্বর' আখ্যায় চিহ্নিত করেছে। এই অসভ্য-বর্বর, অখ্যাত-অজ্ঞাত যে মানুষজন তাকেই আমরা চিনি 'নিম্নবর্গে'র মানুষ বলে।

'বাংলাসাহিত্যে নিম্নবর্গ তথা সাধারণ মানুষের অনুপ্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে ইংরেজ আগমণের পর, সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবজাগরণের ফলস্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলাসাহিত্যে একাধিপত্য ছিল দেবতা ও দেবানুগৃহীত পুরুষের— এবকম অভিযোগ আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি যদি আমরা সজাগ দৃষ্টিপাত ও পর্যবেক্ষণ করি. তাহলে দেখব এই দুই সাহিত্য ধারায় নিম্নবর্গের মানুষের এক বিশাল স্রোত বর্তমান।

বাংলাসাহিত্যের আদিযুগের প্রথম নিদর্শন পাই চর্যাপদে। সিদ্ধাচার্যদের এই সাধন সঙ্গীতগুলিতেও পাই সাধারণ মানুষের কথা। সে যুগেও দেখি হাঁড়িতে ভাত নেই. দারিদ্রের শেষ নেই অথচ অতিথির বিরাম নেই, এমন ছবির পর ছবি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেবতার নামের আড়ালে আছে রক্তমাংসে গড়া গোপল্লীর অতি সাধারণ মানুষের বর্ণনা।

'মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের বৃহত্তম ধারাটি হলো মঙ্গলকাব্যের। এই মঙ্গলকাব্যকে অনায়াসে জনসাহিত্য বলা চলে। এই সাহিত্যে সাধাবণ মানুষের জীবনঅতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত। মনে হয়, এই কাব্যরচয়িতা, পাত্র-পাত্রী এবং পাঠক বা শ্রোতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের নিম্ন-মধ্যবিত্ত স্তরের অধিবাসী। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' বা ঘনরাম-রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গলকাব্য'

সেই গোত্রের যেখানে আর্যঅধ্যুষিত সংস্কৃতির অভ্যস্ত প্রেক্ষাপট ও বাতাবরণে দাঁড়িয়ে কবিরা অনার্য সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। 'চণ্ডীমঙ্গল', 'শিবায়ণ' প্রভৃতি কাব্যের বর্ণনায় তৎকালীন বাংলার পল্লীজীবন চিত্র রূপায়িত হয়েছে। নাথ সাহিত্য ও লোকধর্ম নির্ভর সাহিত্য কর্ম। মাণিকচন্দ্র রাজা, গোপীচন্দ্র তার রাণীরা, খেতুয়া রাজা, স্বয়ং রাণী ময়নামতীও প্রকৃত পক্ষে নিম্নবর্গের মানুষ। বৈষ্ণব পদাবলীতে শুনি—

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষজনকে সামনে রেখে মানবমহিমার জয়গান ঘোষিত হয়েছে। শাক্ত পদাবলীর আগমণী ও বিজয়ার গানগুলি সাধারণ তথা নিম্নবর্গের মানুষের আশা-বেদনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মধ্যযুগে জাত অনার্যকৃষ্টি ও সাহিত্যের কথা যদি আরো আলোচনা করি তাহলে পাব পল্লীসহিত্য বা লোক সাহিত্যের বিশাল সম্পদ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকসাহিত্য ব্যষ্টির সৃষ্টি নয়, সমষ্টির সৃষ্টি। গ্রামবাংলার অনভিজাত, জাতিহীন, গরিমাহীন, যন্ত্রবর্জিত নিম্নবর্গের মানুষের অন্তরে সৎ সত্য অনুভূতির কথামালা হল এই বাউল, ভাটিয়ালি, জারি, সারী, দেহতত্ত্ব, গাজী, মুর্শিদী, ফকিরী, ভাওয়াইয়া, টুসু। এঁদের প্রায় সকলেই নিম্নবর্গের মানুষ। আবুল আহসান চৌধুরী এঁদের সম্পর্কে 'দেশ' পত্রিকায় বলেছেন— "অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর বাউলেরা তো গরিবের মধ্যে গরিব। মূলত জেলে, জোলা, নিকেরি, কলু, ছুতার, নাপিত, মুচি— নিম্নশ্রেণীর এইসব হিন্দুরাই গোঁসাই গোপালের ভক্ত— অনুসারী। উত্তরাধিকার সূত্রেই এঁরা দরিদ্র— নিঃস্ব" (১৮.২.১৯৯২)। 'মৈমনসিংহগীতিকা' বা 'পূর্ববঙ্গগীতিকায়' অনগ্রসর শ্রেণী তথা নিম্নশ্রেণীর জীবনভাষ্য বর্ণিত হয়েছে।

বাংলার উনিশ শতক চিহ্নিত হয়ে আছে 'বাংলার নবজন্মে'র কাল হিসেবে। সময়টি জাতিয়তাবাদী উত্থানের কালপর্ব। ভিক্টোরিয় ধ্যানধারণার উত্তরসূরি বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে নিম্নবর্গীয় মানুষদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা সম্ভব হয় নি বটে কিন্তু *শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজব্যবস্থার শ্রেণী সংগ্রামের ইঙ্গিত তাঁর রচনায় যে উপেক্ষিত* নয় তার প্রমাণ 'সাম্য' বা 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র বিভিন্ন রচনায়। বিবেকানন্দ সরাসরি উচ্চারণ করেছিলেন 'শূদ্রজাগরণে'র দুঃসাহসী মন্ত্রমালা। আর হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র রঙ্গলালের দেশপ্রেমের বীরপনায় ঠাসা স্বাজাত্যবোধের মহিমাগম্ভীর সাহিত্যিক মহাকাব্যমালার পাশাপাশি ঝড়ো হাওয়ার প্রমত্ততার কবি মাইকেল এনে দিলেন ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত, অবহেলিত প্রাকৃত দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নবভাষ্য। নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় রাম কর্তৃক রাবণ বিজয় মুখ্যত আর্য কর্তৃক অনার্য বিজয়ের ইঙ্গিতধর্মী কাহিনী। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাবণ এবং ইন্দ্রজিৎ পুরুষাকারে সমৃদ্ধ বিপ্লবী নায়ক। তাদের সংগ্রাম উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণ্য উচ্চমন্যতার বিরুদ্ধে। মেঘনাদবধকাব্যে রাবণ নিম্নবর্গীয় প্রতিস্পর্ধার কেন্দ্রবিন্দু। মধুসূদন এই মানুষটির দর্পণে অনার্য ভারতবর্ষে আর্যেতর জীবন ও সংস্কৃতির ছবিটি দেখাতে কার্পন্য করেননি।

'এরপব এল রবীন্দ্রনাথের পর্ব। যাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিচ্ছুরণে আলোকিত হলো আমাদের চেতনাজগৎ। 'আমি'র আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে চলে এলেন কোপাই নদীর তীরে গৃহস্থ ঘরের ভাষা অন্বেষণে। এই অনুসন্ধিৎসার প্রসারিত রূপ আমরা খুঁজে পেলাম 'ওরা কাজ করে' কবিতার বাণীবদ্ধ চিত্রায়ণে—

মাটির পৃথিবীপানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগযুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে

জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল।

'ঐকতান' কবিতায় তাই আহ্বান জানালেন সেই কবিদের যাঁরা, অখ্যাত— অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি একাত্মবোধে আত্মীয়তুল্য হয়ে উঠতে পারে—

এস কবি, অখ্যাত জনের,
নির্বাক্ মনের;
মর্মের বেদনা যত করিও উদ্ধার;

স্বদেশ ও নিজের সমাজের নিম্নবর্গ কৃষক বা অন্ত্যজ পতিত শ্রেণীর প্রতি তাঁর ছিল অগাধ সহমর্মিতাবোধ। তিনি নিজস্ব জমিদারীবলয়ে প্রজাদের-চাষীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে অসহনীয় কষ্টে ভুগেছেন। 'ছিন্নপত্রাবলী' (১৮৯৩) - তে তাই তিনি ব্যক্ত করেন সকল প্রজাদের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের কথা— "আমার কাছে এই সমস্ত দুঃখপীড়িত অটলবিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষাদের আপনার লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে।[৪০] রবীন্দ্র কথনবিশ্বে বিশেষত ছোটগল্প-উপন্যাসে সামাজিক নিম্নবর্গের অভিজ্ঞাত অত্যন্ত স্পষ্ট— যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক এই তিন বাঁড়ুজ্যে, কথাকার সতীনাথ ভাদুড়ি প্রমুখ, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির ধারা থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে মেলে ধরেছিলেন নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতির স্বরূপসন্ধান ও মূল্যায়ণে। পর্যাপ্ত সহানুভূতি সহনশীলতা দিয়ে তাঁরা এঁকেছেন নিম্নবর্গের দিনযাপন, অনুপুঙ্খ সংগ্রাম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত। এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক', তারাশঙ্করের

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসগুলোকে প্রতিনিধিস্থানীয় হিসেবে বিবেচিত করতে পারি। আমাদের যেহেতু নিম্নবর্গীয় চেতনার সংকেতবিশ্ব ছোটগল্পের আলোচনায় সীমাবদ্ধ সেহেতু বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এই চেতনার বিকাশ আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভে উপস্থাপিত চারজন বিস্মৃত গল্পকারদের পূর্ববর্তী অবস্থান পর্যন্ত জেনে নেওয়া জরুরি।

বাংলা ছোটগল্পের বয়স খুব বেশি নয়, তবু বাংলার সমাজ বিবর্তনে ছোটগল্প এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সমাজ ও সাহিত্য যেহেতু পরস্পর নির্ভরশীল সেহেতু ছোটগল্পেও সমাজের নানা স্তর, নানা বিন্যাস প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প শাখার প্রথম ভগীরথ হলেন রবীন্দ্রনাথ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লেখা শুরু করেন, এবং আমৃত্যু লিখে চলেন বিংশ শতকের চারের দশক পর্যন্ত। তাঁর গল্প-উপন্যাসে সমাকালীন সামাজিক সমস্যা সমাজসংশ্লিষ্ট জীবনভাবনা অত্যন্ত জোরালো ও স্পষ্ট। যদিও তাঁর উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পে নিম্নবর্গের অধিকার, স্বকীয়তা অনেক বেশি। অস্পৃশ্যতা, জাতপাতের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গীয় চেতনার সংকেতবিশ্ব পরিস্ফুট হয়েছে 'অনধিকার প্রবেশ' (১৩০১), 'মুসলমানীর গল্প' (১৩৬২), 'দুরাশা' (১৩০৫) প্রভৃতি গল্পে। প্রজাদের ওপর শাসন-শোষণ, অন্যায়-অবিচার বহুবিচিত্ররূপ অঙ্কিত হয়েছে 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩০১) 'উলুখড়ের বিপদ'(১৩০৭) 'দুর্বুদ্ধি'(১৩০৭), 'হালদার গোষ্ঠী' (১৩২১), 'সমস্যাপূরণ' (১৩০০) ইত্যাদি গল্পে। নিম্নবর্গীয় নারীর অবস্থানকে চিনে নিতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'দেনা পাওনা' (১২৯৮) ও 'শাস্তি' (১৩০০) গল্পের মধ্য দিয়ে।

এরপর আমরা সমাজসচেতন শিল্পী হিসেবে শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯০৮) কথা বলতে পারি। শরৎসাহিত্য নিম্নবর্গীয় জীবনচিত্রে ভরপুর। সামাজিক অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র ছিলেন খড়্গহস্ত। 'মহেশ' (১৩২৯),

'অভাগীর স্বর্গ' (১৩২৯) ও 'একাদশী বৈরাগী' (১৩২৪) প্রভৃতি গল্পে শরৎচন্দ্র নিম্নবর্গের জীবনচিত্র অপূর্ব ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। দুলেকন্যা অভাগী, দরিদ্র গোফুর জোলা বাংলাসাহিত্যে নিম্নবর্গের অন্যতম প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। বাংলাসাহিত্যে নিম্নবর্গ তথা অন্ত্যজ শ্রেণীর চরিত্রেরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে হাজির হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজকালপরশুর গল্প' 'রাঘব মালাকার', 'হারানের নাত জামাই', 'রাশের মেলা', 'সাড়ে সাত সের চাল', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারী ও নাগিনী', 'তারিণী মাঝি', 'বেদেনী', 'আড়াইয়ের দীঘি' এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা', 'উপেক্ষিতা', 'ফিরিওয়ালা', 'ফকির', 'বারিক অপেরা', 'আহ্বান' প্রভৃতি গল্পে। কল্লোল পর্বে এ ধারার পরিচয় পাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সংসার সীমান্তে' অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের 'ভুখা', 'মেথর-ধাঙড়', 'হাটবাজার', 'হাড়ি-মুচি-ডোম', 'মুচি হয়ে শুচি হয়', 'দাঙ্গা', 'সারেঙ', বুদ্ধদেব বসুর 'ফেরিওয়ালা' জগদীশ গুপ্তের 'পুরাতন ভৃত্য', 'অরূপের রাশ', প্রবোধ কুমার সান্যালের 'নীচের তলায়', 'ছবি', 'কবরের তলা থেকে' প্রভৃতি গল্পে। এ প্রসঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ি, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, সরোজ রায়চৌধুরী ও সোমেন চন্দ প্রমুখ গল্পকারের নাম করতেই হয়। সতীনাথ ভাদুড়ির 'পূতিগন্ধ' ও 'তলানির স্বাদ' গল্পে নিম্নবর্গীয় নারীর পরিসর ও চেতনার বিকাশ লক্ষ্য করি। বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) 'ছোটলোক', 'বুধনী', 'কসাই', প্রভৃতি গল্প নিম্নবর্গের প্রতি সহমর্মিতাবোধে উজ্জীবিত। কল্লোলপর্বের আর এক সমাজসচেতন ও বিস্মৃতপ্রায় গল্পকার সরোজ কুমার রায়চৌধুরী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সমাজ প্রেক্ষায় নিম্নবর্গীয় মানুষের সংকটকে তুলে ধরেন 'ব্ল্যাকমার্কেট' গল্পে। তাঁর 'দুনিয়াদারী' গল্পেও নিম্নবর্গের স্বরায়ন লক্ষ্য করা যায়। বাংলাসাহিত্যে আর এক বলিষ্ঠ, সংগ্রামী মানসিকতাপূর্ণ ও নিম্নবর্গের প্রতি সহানুভূতিশীল গল্পকার হলেন সোমেন চন্দ। তাঁর 'প্রত্যাবর্তন' গল্পে নায়ক প্রশান্ত কালু মিঞাকে বলে— 'আমাদের কোন জাত নেই' অর্থাৎ দরিদ্র, বঞ্চিত,

নিপীড়িতদের জাত একটাই— তারা মানুষ। এই বোধেই সোমেন চন্দ উদ্দীপ্ত হয়ে লেখেন 'সংকেত', 'ইঁদুর', 'দাঙ্গা'-র মতো অবিস্মরণীয় গল্পগুলি। এভাবেই বাংলা গল্প ইতিহাসে নিম্নবর্গের পরিসর ও স্বরায়ন উন্মোচিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য চার গল্পকার— যথাক্রমে নারায়ণ ভট্টাচার্য, রমেশচন্দ্র সেন ও কল্লোল পর্বের শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং মণীশ ঘটক— নিম্নবর্গের সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, তাদের সংগ্রামী মেজাজ ও ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ— সবকিছুই বহু বিচিত্র বৈভবে তাঁদের গল্পবিশ্বে তুলে ধরেছেন। এই উন্মুক্ত পরিসরের খোঁজই আমাদের অন্বিষ্ট।

তথ্যসূত্র

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা' (১২৮৭) বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮০, পৃঃ ৩৩৬-৩৩৭.

২. নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসের সীমা, 'ইতিহাসচর্চা', কৃষ্টি প্রকাশনী, ২০০১, পৃঃ ৮.

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্বসাহিত্য', পৃঃ ৫৪.

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পূর্ব ও পশ্চিম'.

৫. তদেব

৬. জ্যোতির্ময় ঘোষ, 'সহস্রাব্দের ব্রাত্যগান ও রবীন্দ্রনাথ', সাহিত্যলোক, ১৪০৬, পৃঃ ৯২.

৭. অমলেশ ত্রিপাঠী, 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক', প্রথম সংস্করণেব (১৯৮৮) মুখবন্ধ, পঃ বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃঃ- VII

৮ মৃদুচ্ছন্দা পালিত, ইতিহাসচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ, টেগোর রিচার্স ইনস্টিটিউট, ১৯৯৮, পৃঃ ২০৯.

৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতবর্ষের ইতিহাস, রবীন্দ্ররচনাবলী— ১২শ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পঃ বঙ্গ সরকার, পৃঃ ১০২৮

১০ তদেব, পৃঃ ১৩২৭

১১ ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারত-ইতিহাস চর্চা', ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪৫০

১২ অমলেশ ত্রিপাঠী, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ, পঃ বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ', ১৯৮৮, পৃঃ V.

১৩. ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের প্রাণ', পৃঃ ২১৩.

১৪. অমলেশ ত্রিপাঠী, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ, পঃ বঙ্গ রাজ্যপুস্তক, ১৯৮৮, পৃঃ VIII.

১৫. তদেব, পৃঃ IX

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাশিয়ার চিঠি', রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ পঃ বঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা- ৬৭৫.

১৭. Hannanh Arendt, 'Between Past and Present', Viking Press, New York, 1961, Page-7.

১৮. দ্রষ্টব্য— নিউ লেফট রিভিয়্যু, জুলাই- ১৯৯৪.

১৯. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র', ভল্যুম-২, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৯৫৩, পৃঃ ২৭৭-৭৮.

২০. Ranjit Guha (Ed.) 'A Subaltern Studies Reader-1986-95 'Chandra's Death', Oxford University Paper Backs, 2000, Page-34-35.

২১. Antonio Gramsci, 'Notes on Italian History', Selection from the Prison Notebooks, Orient Longman, 1996.

২২. Ranjit Dasgupta, 'Significance of Non-Subaltern Mediation, in I.H.R. Vol. XII, N: 1-2 (July, 1985, January 1986) Page-383.

২৩. দ্রষ্টব্য ঃ সুধীর চক্রবর্ত্তী, নতুন দিশা, নতুন সমীক্ষণ ('নিম্নবর্গের ইতিহাস'-গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), দেশ, মার্চ, ২০০১, পৃঃ ৮৫.

২৪. রণজিৎ গুহ, নিম্নবর্গের ইতিহাস, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' (সম্পা ঃ গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়) আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃঃ ৩২.

২৫. তদেব, পৃঃ ৩৩

২৬. তদেব, পৃঃ ৩৯ ।

২৭. সোমনাথ রায়, 'এক উন্নতশির মার্কসীয় চিন্তানায়ক' (গ্রন্থ পর্যালোচনা), দেশ, ১৯৯৯, পৃঃ ১২২.

২৮. Ashok Sen, 'Subaltern Studies-V' (Ranjit Guha ed.), Oxford University Press, Delhi, 1987, page- 203.

২৯. Sumit Sarkar, 'Subaltern Studies-III' (Ranjit Guha ed.), Oxford University Press, Delhi, 1999, Page- 273.

৩০. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'ভূমিকা ঃ 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃঃ ৩.

৩১. Veena Das, Subaltern as Perspective, Subaltern Studies-VI (Ranjit Guha ed.), Oxford University Press, Delhi, 1999, Page-312.

৩২. Jean-Paul-Sartre, 'The being of consciousness', The Philosophy of Jean-Paul-Sartre, R.D. Cumming (ed.), Vintage Books, 1972, page- 179.

৩৩. গৌতম ভদ্র, 'নিম্নবর্গ বনাম উচ্চবর্গ, 'এক্ষণ'- শারদীয় সংখ্যা- ১৩৮৯, পৃঃ ৪৬.

৩৪. দ্রষ্টব্য ঃ- 'সোশ্যাল সায়েন্টিষ্ট' পত্রিকা, ভল্যুম-১২, সংখ্যা ১০, অক্টোবর-১৯৮৪.

৩৫. Dipesh Chakraborty, Invitation to Dialogue, 'Subaltern Studies-IV', (Ranjit Guha ed.), Oxford University Press, Delhi, 1987, Page-375.

৩৬. অজিত চৌধুরী, 'সাবঅলটার্ন স্টাডিস ঃ তিনটি বা দুটি প্রশ্ন যা আমি করতে পারি' অনুষ্টুপ, শারদীয়-১৩৯২, পৃঃ ৩৫-৬৫.

৩৭. Robert Denoon Cumming. (ed.)— The Philosophy of Jean-Paul-Sartre, 'Self Consciousness', Vintage Books, New York, 1972, Page-51.

৩৮. অশোক মিত্র, 'ইতিহাসের দায়', নন্দন— মার্কসবাদ সংখ্যা, মে' ১৯৯৩, পৃঃ- ১১৬.

৩৯. অশোক সেন, 'সার্দিনিয়ার প্রান্ত থেকে ধনতন্ত্রের সীমান্ত', শোভনলাল দত্ত গুপ্ত সম্পাদিত— আনতোনিও গ্রামশি ঃ বিচার ও বিশ্লেষণ, ২য় খণ্ড, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ- ৭২.

৪০. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, ছিন্নপত্রাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ- ১২৪.